রোগীর জগৎ

শ্রীসুধাকান্ত দে

কলিকাতা
২১ ফাল্গুন, ১৩৩৭

উৎসর্গ

বাবা ও মার চরণকমলে

এই গল্পগুলি অঞ্জলি

দিলাম।

২১ ফাল্গুন, ১৩৩৭।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠাঙ্ক
মুখবন্ধ	৵০
রোগীর জগৎ	৩
পর-নিন্দা	২০
বিচার	৩৭
পরিচয়	৬৬
টেলিফোনের ঘণ্টা	৭৮
কবরের উপর	৯৫
মা ও ছেলে	১১৪
পিতৃঋণ	১২২

মুখবন্ধ

১

গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি অনেক দিন, কিন্তু পুস্তকাকারে ছাপাইবার চেষ্টা এই প্রথম। গল্পগুলি ছাপাইতে গিয়া আবার পড়িতে হইয়াছে ও নিজে নিজে সমালোচনা করিতে হইয়াছে। তাতে দেখিতেছি এইরূপ ফেলিয়া রাখাটা আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টদায়ক হইলেও—কারণ, নেহাৎ ছাপাইবার অসামর্থ্য হেতুই ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম—এক দিকে ভালই হইয়াছে। আজ এগুলির দোষগুণ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার শক্তি জন্মিয়াছে।

পুরাণা লেখা সব সময়ে ভাল লাগে না। এমন কি, মন্দও লাগে। আমি বেশ জানি, অধিকাংশ গল্প আমার চেয়ে পটুতর হাতে পড়িলে আরো ভাল করিয়া লেখা হইত। কিন্তু এও জানি, বঙ্গভাষায় এদের চেয়ে খারাপ গল্পও হাজার হাজার লোকে পড়িতেছে। বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার কাছে আমার এ গল্পের বই আদর লাভ করিবে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু এই কথা আমি অকপটে বলিতে পারি, তাঁদের কোথাও ঠকাই নাই,—গল্প শুনাইব বলিয়া অন্য কিছু শুনাই নাই। এতে যদি তাঁদের খুসী করিতে পারি ত চরিতার্থ হইব, না পারিলে দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিব।

আমার একটা দোষ আমি গোড়াতেই কবুল করিতেছি। গল্পগুলি যে সময়ে যে ভাবে লেখা হইয়াছিল প্রায় সে ভাবে ছাপা হইল—নূতন যোগ বিয়োগ করা হয় নাই। 'প্রায়' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এক

একটা গল্পে গোড়া হইতে শেষ অবধি ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পরিবর্ত্তন যা হইয়াছে তা পরিমাণে সামান্য।

২

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। এই গল্পগুলি এবং আমার লিখিত অন্যান্য সমস্ত গল্প এক একটি 'এক্সপেরিমেণ্ট' বা প্রতিপক্ষের জবাব মাত্র।

প্রতিপক্ষ বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর জীবনে প্রাণ নাই, বৈচিত্র্য নাই, জটিলতা নাই। ইত্যাদি। এই সব কথা শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালা-পালা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি জোর করিয়া বলিব, এর একটাও সত্য কথা নহে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের তীক্ষ্ণতা, নানা রূপ বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত, জীবনের গভীরতা ও বৈচিত্র্য অন্য কোন দেশের চেয়ে কম নয়। সংসারে পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনা, নিবিড় অনুভূতি আমাদিগকে চারি দিক্ দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে—কত সমস্যার যে সৃষ্টি হইতেছে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে ওলোট্-পালোট করিয়া দিতেছে, তা কি চোখ বুজিয়া 'না না' করিলেই মিথ্যা হইয়া যাইবে? বস্তুত অভাব উপাদানের নয়—অভাব উপাদানকে ব্যবহার করিতে জানে এমন লোকের। গল্প ও উপন্যাসের প্রচুর রসদ্ চারি দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে, কুশলী শিল্পীর অভাবে সেগুলি সুবিন্যস্ত ও সুব্যবহৃত হইতেছে না। তা কি আমাদের জীবনের একঘেয়েত্বের পরিচয়?

আমাদের কথা-সাহিত্য কেন এত পঙ্গু তা লইয়া এখানে আলোচনা করিব না। কিন্তু এই দৈন্য আমাকে পীড়া দেয়। আমরা বাঙ্গালীরা সাহিত্য লইয়া গর্ব্ব করি, আমরা না কি প্রতিভাশালী জাতি, সৃষ্টি-শক্তিতে অদ্বিতীয়! হায়! এমনতর আত্ম-প্রীতি আমাদের উন্নতির পথই শুধু রুদ্ধ করে। পশ্চিমের বড় বড় দেশ—ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইংল্যাণ্ড, রুশিয়া, এমন কি, নরওয়ে, সুইডেনের কথা-সাহিত্যের কাছে আমাদের

কথা-সাহিত্য কি দাঁড়াইতে পারে? ওদের কাছে যে আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়। ওরা ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছে, আর আমরা সেখানে একটি দুটি প্রদীপ জ্বালিয়া উঁচু করিয়া তাদের দেখাইতেছি ও বড়াই করিয়া বলিতেছি, "এই দেখ!" তারা গা টেপাটেপি করিয়া হাসিতেছে।

এরূপ অবস্থাকে বেশী দিন প্রশ্রয় দিলে চলিবে না। সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমাদেরও খাটিবার লোক চাই। কথা-সাহিত্য-সৃষ্টিতে হাত আছে এবং প্রকৃতই ভালবাসে এমন লোকের অনুরাগ ও পরিশ্রমের মূল্য আছে।

এই গল্পগুলির মধ্য দিয়া আমি শুধু জীবনের বিভিন্ন সুরকে ক্ষণেকের জন্য স্পর্শ করিয়া গিয়াছি মাত্র। এই পরীক্ষার ফলে আমি বাঙ্গালী-জীবনের বৈচিত্র্য দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি।

ভাষা সম্বন্ধে ২।১টা কথা নিবেদন করিবার আছে। এই গল্পগুলির ভিতরে ভাষা লইয়াও নানা প্রকার পরীক্ষার প্রচেষ্টা পরিস্ফুট হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলিয়া আমার পক্ষে নির্ভুল কথ্য ভাষা চালান কিরূপ কঠিন ও বিপজ্জনক তা পশ্চিমবঙ্গবাসী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্ববঙ্গের বহু কথা, বহু ভঙ্গী সাহিত্যে স্থায়ী স্থান পাইবার যোগ্য, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু কথ্য ভাষার বিভ্রাট হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় কি? বল্‌বে লিখিব না বোল্‌বে? কর না কোর না কোরো? দেবে না দিবে? যাই না না যাই নে? গেলুম না গেলাম? কতকগুলি মাম্‌লা পুরাণা, কিন্তু নূতন চোখে একবার নড়িয়া দেখা প্রয়োজন। ক্রিয়াপদে 'ছ' এর জায়গায় 'চ' ব্যবহার (যেমন কর্‌চ) বাঙ্গালা ভাষাকে যে কিরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়াছে তা ভাবিবার বিষয়। এর পর 'ছ' একেবারে উঠিয়া না যায়!

আমার মনে হয়, সমগ্র বঙ্গভাষাভাষীর পক্ষে বিনা কষ্টে বিনা বাধায়

যে ভাষা লেখা সম্ভবপর তাই হইল লেখ্য ভাষা। লেখ্য বা সাধু হইলেই ভাষা কঠিন হয় না। আমি সাধু ভাষায় লিখিতে পারি, "বাঘে জল খাইতে আসিয়া একটা গরু ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।" আবার যদি লিখি, "একটি ব্যাঘ্র জল পান কর্ত্তে এসে একটি গাভীকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে নিয়ে গেছে," তবে বাধা দিবার কেহ নাই। ভাষার সরলতা, সরসতা ও সলীলতা সাধু বা কথ্য হওয়ার উপর নির্ভর করে না। তবে কেনই বা কাজ, বাঘ, নেওয়া, ইত্যাদি লিখিয়া সাধু ভাষাকে গ্রহণ না করিব? সাধু ভাষাকে উড়াইয়া দিতে চাহি না।

৩

একটা নিরাশার কথা শুনিতে পাইতেছি। বাঙ্গালায় না কি গল্পের বই বিকায় না। যেখানে উপন্যাস হু হু করিয়া কাটে, সেখানে গল্পের বই একখানা বেচাও শক্ত। বাঙ্গালী উপন্যাস-ভক্ত জাতি।

এ কথাও আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। বাঙ্গালীর উপন্যাস-ভক্তি আছে। তা বলিয়া সে গল্প শুনিতে ভালবাসে না, এমন হইতে পারে না। আসলে বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাকে কৃপা করিয়া ভিক্ষা দিতে গেলে তারা লইতে অক্ষম, এইরূপ মনে হয়। কিন্তু আমি যদি যত্ন ও পরিশ্রমে আহৃত আমার সর্ব্বোত্তম দান তাদের হাতে তুলিয়া দি, তবে কি তারা ফেলিয়া দিবে?

আমি যে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর স্বপ্ন দেখি, সে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী আজও সৃষ্টি না হইতে পারে, কিন্তু যদি পাঠক-পাঠিকার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অবজ্ঞা না রাখিয়া আমার ভাল জিনিষটি দি, তবে তা বুঝিতে সময় লাগে না, এই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। ঠকাইতে গেলে ঠকিতে হইবে, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা জগতের অগ্রসরতম দেশগুলির পাঠক-পাঠিকার তুলনায় যতই পিছনে থাক্, কাচ হইতে সোণা ফারাক্ করিতে তাদের

বেশী সময় লাগে না। আমার গল্পের যে দাম তারা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে তাই মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইব।

৪

গল্পগুলির মধ্যে "পরিচয়" মালঞ্চে এবং "রোগীর জগৎ" ও "পর-নিন্দা" বঙ্গবাণীতে বাহির হইয়াছিল—এই দুই মাসিক পত্রের আজ চিহ্নও নাই। প্রথম গল্পটি প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প, অর্থাৎ আরো লিখিবার উৎসাহ পাইয়াছিলাম। এই দুই পত্রিকার সম্পাদকগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাশ মহাশয় আমার প্রুফ্ দেখিয়া দিয়াছেন ও অন্য বহু প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁর প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

দোলপূর্ণিমা, ১৩৩৭ শ্রীসুধাকান্ত দে

কলিকাতা

রোগীর জগৎ

রোগীর জগৎ

ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘরে ঢুকিল তরুণ সুন্দর যুবক।

"কি খবর?"

"ডাক্তার বাবু, দেখুন ত একবার আমাকে পরীক্ষা করে।"

ডাক্তার বিস্মিত ভাবে তার মুখের দিকে চাহিলেন। স্বাস্থ্যময় নিটোল শরীর। রোগের চিহ্ন ত কোথাও দেখা যাইতেছে না। হাসিয়া বলিলেন :

"তোমাকে পরীক্ষা করবার দরকার করে না। মুখের দিকে চেয়েই বলছি, ভাবনার কারণ নাই।"

"না, ডাক্তার বাবু, না। আপনি সত্যি সত্যি আমায় পরীক্ষা করুন। নইলে আমি মনে শান্তি পাব না"।

ডাক্তার তাঁর ব্যবসার অভিজ্ঞতা হইতে জানেন যে, এ রকম দু'একটা লোক পাওয়া যায়, যাদের সর্ব্বদাই ভয়, এই বুঝি রোগে ধরিল। এ ধরণের লোকদের হাজার কেন প্রবোধ দাও না, সন্তুষ্ট হইবে না। তাদের বুক-পিঠ ভাল করিয়া ঠুকিয়া ও নিশ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা করিয়া যখন বলা হয়, "না ভয় নাই", তখন তারা হাসিমুখে বাড়ী যাইতে পারে, তার আগে নয়।

সুতরাং ছেলেটীর পরীক্ষিত হইবার জন্য ব্যাকুল মিনতিতে যতটা বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল, ততটা বিস্মিত ডাক্তার বাবু হইলেন না। তিনি নীরবে তাকে পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য করিলেন :

"বেশ আছ।"

"বেশ আছি? নিশ্চয় বল্‌চেন?"

"হাঁ।"

তার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে লজ্জিত মুখে পকেট হইতে টাকা বাহির করিতে উদ্যত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল:

"কত দিব?"

"কিছু না।"

"না, না, তা হ'বে না।"

"খুব হ'বে, নিশ্চয় হ'বে, আমি বল্‌চি হ'বে।"

এত জোরের সঙ্গে ডাক্তারকে কথা বলিতে দেখিয়া ছোক্‌রা একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। ইহার পর কি করা উচিত ভাবিতে লাগিল।

ডাক্তার বলিলেন:

"তোমার নাম কি?"

নতমুখে উত্তর করিল:

"কুসুম।"

ডাক্তার ছেলেটির মুখের দিকে তাকাইলেন। না, সে মিথ্যা কথা বলিতেছে না। কিন্তু অদ্ভুত নাম বটে। মেয়ে মানুষের নামই সাজে, অন্ততঃ পুরুষ মানুষের নয়।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন:

"হঠাৎ তোমার নিজেকে পরীক্ষা করাবার খেয়াল হ'ল কেন?"

কুসুম নিঃশব্দে তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"কোন রকম অসুখ বোধ করছিলে?"

"না।"

"অল্প দিন আগে কোন অসুখ হয়ে গেছে?"

"না।

"তবে ?"

উত্তর নাই।

"কোন কারণে ভয় পেয়েছিলে ?"

তবু উত্তর নাই।

"কুসুম—"

"আমায় মাপ করুন, ডাক্তার বাবু, আমি কোন কথা ভেঙ্গে বল্‌তে পার্‌ব না।"

তারপর হঠাৎ নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

এক এক জনের এক একটী লোককে হঠাৎ ভাল লাগিয়া যায়। ডাক্তার বাবুর কুসুমকে দেখিয়াই ভাল লাগিয়া গিয়াছিল। ছেলের মত যেন !

ডাক্তারি ব্যবসায়ে দিনে রাতে কত মুখ দেখিতে হয়, কে তা গণিয়া মনে রাখিতে পারে ? কিন্তু কুসুমের মুখ ডাক্তার বাবুর অনেক দিন পর্য্যন্ত মনে ছিল। তার মধ্যে সে আবার আসিলে তিনি নিশ্চয় চিনিতে পারিতেন। কিন্তু দুই বৎসর তাকে আর দেখা গেল না। তারপর দুই বৎসর পরে সে যখন এই ডাক্তারখানায় আসিয়া দেখা দিল তখন ডাক্তার বাবু তাকে একেবারে ভুলিয়া গেছেন।

কুসুম কিন্তু ভাবিয়া রাখিয়াছে, ডাক্তার বাবু তাকে এখনো চিনিবেন। তাই সে ঘরে ঢুকিয়া দিব্য পরিচিতের মত বলিল :

"ডাক্তার বাবু!"

ডাক্তার বাবু তার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

"চিন্‌তে পার্‌চেন না আমায় ?"

"মনে পড়্‌চে না বাপু।"

"সেই যে এসেছিলাম",—কুসুম তাঁকে স্মরণ করাইয়া দিল।

ডাক্তার হাসিলেন :

"তারপর, কি মনে করে ?"

"আজ আবার এলাম।"

"কি জন্য ?"

"আজও আবার পরীক্ষা করে দেখুন।"

"কেন বল ত ?"

"দেখুন ডাক্তার বাবু, নইলে আমার দিন কাটানো ভার হ'বে।"

ডাক্তার লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, ছেলেটা আগের চেয়ে কালো হইয়া গিয়াছে। চোখের ভিতর উদ্বেগ বাড়িয়াছে। দেখিয়া কষ্ট হইল।

"কুসুম, কি তোমার মনের কথা, খুলে বল না ?"

"আমি পারি না, ডাক্তার বাবু, পারি না।"

সে কি কাতর কান্নার মত স্বর !

ডাক্তার বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কোন গলদ খুঁজিয়া পাইলেন না। হাসিয়া বলিলেন :

"তোমার মিথ্যা সন্দেহ।"

"কিন্তু এই সন্দেহ দিনে দিনে আমার জীবনটাকে বিষাক্ত করে তুলচে, ডাক্তার বাবু। আমার হাস্‌তে ভয় করে।"

"কিন্তু কেন ?"

"তা বলতে পার্‌ব না।"

"কিসের সন্দেহ ?"

"মাপ করুন, ডাক্তার বাবু।"

ইহার পর এক বৎসর মধ্যে কুসুম পরীক্ষিত হইবার জন্য আরো দু'বার আসিল। ডাক্তার দুইবারই পরীক্ষা করিয়া কিছু পাইলেন না।

ছেলেটা একটা অকারণ মোহে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া তাঁর দুঃখ হইত। তাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ফল হয় না। কি তার সন্দেহ ভাঙ্গিয়া বলে না, আর তাঁর কাছে পরীক্ষিত হইয়া বাকী সময়টা সে কোথায় কি ভাবে কাটায়, কিছুতেই বলে না। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে—"মাপ করুন, ডাক্তার বাবু।"

কি রহস্য তার জীবনে, ডাক্তার উদ্ঘাটন করিতে পারিলেন না।

কিন্তু সে রহস্য একদিন আপনিই উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। কুসুম পরীক্ষার জন্য আবার আসিল। মনোযোগের সঙ্গে বার বার তাকে পরীক্ষা করিলেন। কি দেখিলেন কে জানে! তাঁর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

আতঙ্কিত কুসুম বলিল :

"কি হয়েচে, ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তারের মনে অনুতাপ দেখা দিল। প্রচুর হাসিয়া বলিলেন :

"কই কিছু ত না।"

"আপনি আমায় লুকাচ্চেন।"

"না কুসুম, লুকা'ব কেন?"

"দেখ্‌বেন, লুকা'বেন না যেন। আমি খুব বিশ্বাস করেই আপনার কাছে আসি।"

কিন্তু লুকাচুরি কতদিন আর চলে ? সন্দেহ সত্য হইয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তার মনে মনে বলিলেন :

"হায় ভগবান্! ছেলেটার উপর মায়া বসে গেছে। তারপর কি না এই দেখ্‌তে হ'ল ?"

ডাক্তার বলিলেন :

"কুসুম !"

"কেন. কেন, কেন, ডাক্তার বাবু, কেন ?"

"না, এমন কিছু নয়। তোমার দেশ বেড়াতে খুব ভাল লাগে, না ?"

কেমন এক রকম মুখ করিয়া কুসুম ডাক্তারের দিকে তাকাইল।

"খুব দেশ বেড়াবে, বুঝ্‌লে ? কত লোকের সঙ্গে মিশ্‌বে, কত রকম শিখ্‌তে পার্‌বে। এই সব দেশ বিশেষ করে বেড়াবে. পুরী, মধুপুর..... "

কুসুম থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

"ও কি, কুসুম, কাঁপচ কেন ?"

"তা হ'লে সত্যি সত্যি আমার রক্ষা নাই, ডাক্তার বাবু, আমার সত্যিই হ'ল।"

টেবিলের উপর মুখ রাখিয়া ছেলেটা কাঁদিয়া ফেলিল। এখানে কি সান্ত্বনার কথা বলা যাইতে পারে ? আর মিথ্যা বলিয়া লাভই বা কি হইবে ?

তবু ডাক্তার বাবু চেষ্টা করিয়া বলিলেন :

"অত নিরাশ হ'য়ো না, কুসুম। আমি তোমার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ব. আর শহরের সমস্ত বড় বড় ডাক্তারকে লাগাব। তুমি ভেবো না।"

কুসুম কাঁদিতেই লাগিল।

ডাক্তার তার মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিলেন :

"কিন্তু বাবা, এই সন্দেহের কথা আগে আমায় জানাও নি কেন?"

"কি হ'ত জানিয়ে?"

"আমি আগে থেকে চেষ্টা করতাম।"

"বৃথা আশ্বাস দিবেন না, ডাক্তার বাবু, আমি সইতে পারি না।"

"কিন্তু আগে থেকে জানালে, যত রকমে পারি আমি চেষ্টা করে দেখ্‌তাম।"

"তাতে কিছু হ'ত না, ডাক্তার বাবু, আমি জান্‌তাম ধ্রুব সত্য—নিয়তি আমার দিকে এগিয়ে আস্‌বেই। আমি বাঁ—চ—ব না।"

"কুসুম!"

"ডাক্তার বাবু! সব কথা আপনি জানেন না। আমি মরতে ভয় পাই না। কিন্তু·····কিন্তু······এমন করে মরণ····· ডাক্তার বাবু, কেমন ক'রে আমি আপনাকে সব বোঝাবো?"

"সব খুলে বল, বাবা।"

"আমি যে ন'মাসে ছ'মাসে আপনার কাছে এসে দেখা দিতাম, সে কি অম্‌নি দিতাম? যত যত স্বাস্থ্যকর জায়গা আছে সব ঘুরে বেড়িয়েচি। তবু······এলো। ঠেকিয়ে ত রাখ্‌তে পারলাম না।"

যক্ষ্মা!

যত যত স্বাস্থ্যকর স্থান আছে কুসুম আবার সর্ব্বত্রই ঘুরিল। কিন্তু ঐ ভীষণ রোগের হাত হইতে সে নিস্তার পাইল না। দিনে দিনে তাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

রোগ যখন ধরে নাই, তখন অস্থিরতা খুব বেশী ছিল। কিন্তু রোগ যত ভাল করিয়া ধরিল, অস্থিরতা কমিয়া গেল, শান্ত ভাব দেখা দিল, মুখেও একটা স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। একদিন ডাক্তারকে আসিয়া বলিল :

"আর নয়!"

"কি নয়?"

"জীবনের জন্য মরণের ভয়ে এমন করে আর ছুটাছুটি করে বেড়াব না।"

"কিন্তু তুমি ত জানো, এর চিকিৎসা শুধু হাওয়া বদ্‌লানো। বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে নিশ্চয় কোথাও উপকার পাবে। তারপর ভাল হয়ে যাবে।"

"ডাক্তার বাবু, মিথ্যা আমায় আশ্বাস দিচ্চেন। আমি জানি আমি বাঁচব না।"

"বলি শোন। বাঁচা মরার কথা মানুষে বল্‌তে পারে না। কোথা থেকে কি হয় কেউ জানে না।"

"মরার কথা মানুষ বল্‌তে পারে না, এ যেমন সত্য কথা ডাক্তার বাবু, যখন মরণ কাছে এসে থাকে তার কথা মানুষ টের পায়, এও তেম্‌নি, তার চেয়েও, সত্যি কথা। তা যদি না হ'বে সুস্থ সবল আমি কেন ছুটে ছুটে এসেচি অপনার কাছে পরীক্ষার জন্য? কেন আমি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েচি? কে আমায় বলে দিয়েছিল, ডাক্তার বাবু?"

"সেই প্রশ্নই ত তোমায় কতবার করেচি, কিন্তু তুমি উত্তর দাও নি।"

"কি উত্তর দিব? কি আপনি শুন্‌বেন? এই কথা শুনে আপনার কি লাভ হ'ত ডাক্তার বাবু যে, আমার মার যক্ষ্মা ছিল, বাবারও যক্ষ্মা ছিল, দুই কুলে অধিকাংশই মরেচেন ঐ রোগে?"

"কিন্তু তুমি তা আমায় বল নি। আর এতেই বা হয়েচে কি? এ জন্য তোমারও ঐ রোগ হ'বে, এ কথা কে বল্ল?"

"কে আবার, আমার মন!"

"আর হ'লেও যে সার্‌বে না, এমন কথা কেউ বল্‌তে পারে না।"

কিন্তু কথাটা বড় সহজ নয়। বাহিরে যা বলিলেন, ভিতরে তার জন্য ভরসা পাইলেন না। সমস্ত কথা ভাবিয়া নিজে শিহরিয়া উঠিলেন। কুসুম হাসিয়া বলিল :

"ডাক্তার বাবু, আমি শুধু মোহে পড়ে বিশ্বাস করেছিলাম, আমার কিছু হ'বে না। তারই উপর ভর করে অনেক স্বপ্ন গড়েছিলাম। কিন্তু সব ভেঙ্গে চুরমার্ হয়ে গেল।"

কুসুমের দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ডাক্তার চোখের জল মুছাইয়া স্থিরভাবে বলিলেন :

"স্থির হও, বাবা।"

কুসুম বলিতে লাগিল :

"শুনুন ডাক্তার বাবু, তারপর বলুন, আমার পক্ষে স্থির হওয়া সম্ভব কি না।

"মেয়েটির নাম নীলা। তাকে ভালবেসেচি। ভাল বাসি। নীল তার চোখ, প্রাণ মাতানো তার চাউনি। আমার চোখের উপর যত বার তার চোখ পড়েচে, আমার সমস্ত আত্মা আনন্দে নেচে উঠেচে।

"নীলা! কি মিষ্টি নাম! কি ভালবাসি তাকে! কিন্তু এখন? আমাকে এই ভালবাসা বুকে করেই মর্‌তে হ'বে।

"আমি জানি, আমার পক্ষে ভালবাসা ভুল হয়েছিল। কিন্তু কি কর্‌ব ডাক্তার বাবু? আমি সব সময়েই মেয়েদের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েচি। তবু ধরা পড়ে গেলাম, তবু জড়িয়ে পড়্‌লাম।

"নিজেকে অনেক শাসন করেছিলাম, অনেক কষ্ট ও বেদনা দিয়েছিলাম। কিন্তু নীলা! কে তাকে না ভালবেসে থাক্‌তে পারে? যে একবার তার ঐ চোখের দিকে তাকিয়েচে, সে আপনাকে না ভুলে থাক্‌বে কেমন করে? ডাক্তার বাবু, আমার সমস্ত শক্তি জড় করেও মুক্তি পেলাম না। ভালবাস্‌তে হ'ল। নীলা আমার নীলা!

"তাতে শুধু কষ্ট বেড়েচে। তাকে পাব না জানি, তবু তাকে ভালবেসে মর্‌তে হ'বে। দূরে থেকে তার কথা ভাব্‌তে হ'বে।"

তিন মাস পর। কুসুমের জ্বর হয়। শরীর ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন শুইয়াই সময় কাটাইতে হয়।

ডাক্তার তাকে নিজের বাটিতে লইয়া আসিয়াছেন। কুসুম আপত্তি তুলিতে বলিয়াছিলেন ঃ

"আমার ভয় কি, বাবা? আমি বুড়া মানুষ, বেশী দিন বাঁচব না নিশ্চয়ই, না হয় দু'দিন আগেই মরব। কিন্তু তা বলে তোমাকে একা অযত্নে ফেলে রাখ্‌তে পারি না।"

আপত্তি টিঁকে নাই।

"ডাক্তার বাবু, আপনি আমার কে যে আমার জন্য এমন কর্‌চেন?"

"কেউ না হ'লে কি আর কর্‌তে নাই?"

"কিন্তু কেউ করে না। একটা কথা মনে করে আশ্চর্য্য হই। মানুষ যে সব কাজ করে, তার সকল গুলির মূলেই কি একটা অদৃশ্য শক্তি রয়েচে? নইলে শহরে এত ডাক্তার থাক্‌তে আপনার কাছেই আমি বার বার এসেচি কেন? আপনাকে চিন্‌তাম না, তবু আপনার কাছে কে যেন আমায় টেনে নিয়ে এসেচে। কে নিয়ে এল?"

"ভগবান্।"

"ভগবান্? আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না, ডাক্তার বাবু।"

হায় হায়! শেষ আশা ও আশ্রয়স্থল যে ভগবান্ তাতেও যে মানুষ বিশ্বাস হারাইয়াছে, তার উপায় কি? তার যন্ত্রণার পরিমাণ কে অনুমান করিবে? ছেলেটা দিনে দিনে দগ্ধ হইতে লাগিল।

"ডাক্তার বাবু!"

"কি বাবা?"

"এখন কি রাত অনেক হয়েচে?"

"একটা বেজে গেছে। ঘুমাও।"

"কিছুতেই ঘুম আস্‌চে না। কত কথা যে মনে আস্‌চে!"

"বল।"

"আচ্ছা, ডাক্তার বাবু, মানুষকে কেন এত কষ্ট অকারণ সইতে হয়? ... পৃথিবীতে ন্যায় বিচার কোথাও কি নাই?"

"আছে বৈ কি।"

"না, কোথাও নাই। আসলে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নাই। সমস্ত এক অন্ধ শক্তির কাজ। আর সে অন্ধ শক্তি নিয়মের বশে চলে।"

"কি বল্‌চ?"

"এই দেখুন না, আমার যে এ রোগ হ'ল, কেন হ'ল? এর জন্য কি আমি দায়ী? যদি আমার দিক্ থেকে বিচার করা যায়, তবে এমন কি নির্দ্দয় কেউ আছে, যে বল্‌বে অপরাধ আমার?

"বাপ মায়ের জন্য ছেলে কেন ভোগে, ডাক্তার বাবু? কেন ছেলে

নূতন করে জীবন আরম্ভ করতে চাইলে, তাকে জোর করে ভেঙ্গে চুরমার্ করে দেওয়া হয়!

"বিশ্বাস করুন, ডাক্তার বাবু, আমার দোষে কিছু হয় নি। আমি আপনাকে অকপটে বল্‌চি, মনে আমার একটু কু ভাব যদি এসেচে, তখনি নিজেকে কঠোর শাসন করেচি। কাজে, কথায় পবিত্র থাক্‌তে চেষ্টা করেচি। তবু……

"আপনারা ঈশ্বর মানেন। এই কি ন্যায়বান্ ঈশ্বর? এই তাঁর বিচার? এ বিচারে মানুষই যে চোখের জল ফেলে।"

"ডাক্তার বাবু!"

"কেন বাবা?"

"ঘুমিয়েছিলেন?"

"না। কিছু বল্‌বে?"

"আচ্ছা, ডাক্তার বাবু, বল্‌তে পারেন কেন আমি জন্মেছিলাম? সময় সময় ভাবি জন্মাবার কি দরকার ছিল? ভেবে কূল পাই না। আমি যদি না জন্মাতাম, তবে এ পৃথিবীর কতটুকু ক্ষতি হ'ত?"

"কি করে বল্‌ব বাবা।"

"এক বিন্দুও হ'ত না। আমি বেঁচে যেতাম। তবু জন্মাতে হল। আর কি জন্ম! এ কি জন্ম? এই যে যাবার দিনগুলিতে অসহ্য কষ্ট ও বেদনা পেয়ে যাচ্চি, এর কি দরকার ছিল? এই কি ভালো হ'ল?

"এই জীবন!

"ডাক্তার বাবু, যদি জীবন পেয়েছিলাম, আর এই রকম,……তবে কেন সঙ্গে সঙ্গে মনে সুস্থ লোকের মত নানা আকাঙ্খা জন্মেছিল?

"এ সব আকাঙ্খা না জন্মালে, আমার এ জীবন পেয়েও ভত, কষ্ট হ'ত না। এই বেঁধে মারার কি দরকার ছিল? শরীর রোগী, অথচ মন সুস্থ। এই সুস্থ মন নিয়ে কি আমার হ'ল?

"কত কিছু কর্‌তে পার্‌তাম। কত কিছু কর্‌ব বলে আশা করেছিলাম। কেন আমার মনে এই সব আশা এসেছিল?

"কত ভালবেসেচি। আরো কত ভালবাস্‌ব নীলাকে, ভেবেচি। সুখের ঘর তৈরী হ'বে। তাতে থাক্‌ব আমি আর নীলা, নীলা আর আমি, ভেবেচি। কেন এই সব ভেবেছিলাম?

"রুগ্ন যে তারও মনে কেন অনন্ত ইচ্ছা তাকে এমন করে দগ্ধ কর্‌বার জন্য? এই কি সুবিচার?"

"কুসুম"!

"ডাক্তার বাবু।"

"বড্ডো ছট্‌ফট্‌ কর্‌চ বাবা। খুব কি কষ্ট হচ্চে?"

"খুব। কিন্তু কষ্ট শরীরে নয়, মনে।"

"ঘুম আস্‌চে না?"

"কিছুতেই আস্‌চে না।"

"আজ তুমি আমায় একটা কথা বল। তুমি নীলার ঠিকানাটা আমায় দাও। আমি কাল সকালে তাকে একবার ডেকে আন্‌ব। তোমার এত কষ্টের কথা শুন্‌লে সে কি একবার তোমায় দেখ্‌তে আস্‌বে না?"

"ডাক্তার বাবু, আপনাকে এখনো সব কথা বলা হয় নি। কিন্তু না বলেও যেতে পার্‌ব না। নীলা আমায় চিন্‌বে কেমন করে?"

"চিন্‌বে না ?"

"না, ডাক্তার বাবু !···অত ঘৃণা ও বিস্ময়ের সঙ্গে মুখ ফিরাবেন না। তার ত কোন দোষ নাই। নীলাকে এমন মেয়ে মনে কর্‌বেন না। সে প্রিয় জনের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। আমি তাকে জানি। সে অপরিচিতের জন্যও অনেক কিছু কর্‌তে পারে।

"অতখানি পরিচয় না পেলে কি আমার প্রাণ নীলা অত সহজে টেনে নিয়ে যেতে পারত ? না, তাকে অত ভাল বাস্‌তে পার্‌তাম ?

"তার হৃদয় আমি দেখেচি। তাকে আমি চিনি।

"কিন্তু······কিন্তু······ডাক্তার বাবু, নীলাকে আমি আমার সঙ্গে পরিচিত হ'তে দিই নি।"

বাহিরের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া ডাক্তার স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কুসুম বলিয়া যাইতে লাগিল :

"কেন দিব. ডাক্তার বাবু ?

"ডাক্তার বাবু, আমার বুক ফেটে যেত তাকে শুধু দূর থেকে ভালবেসে তৃপ্ত থাক্‌তে। কত সময় মনে করেচি, এ বাঁধ ভেঙ্গে ফেল্‌ব। আপন মনে নিজের দেওয়া এই দুঃখের জন্য কত কেঁদেচি।

"কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল।

"ডাক্তার বাবু, আজ আমার সমস্ত বিগত দুঃখের কাঁটা মাথার মুকুট হয়েচে। যদি তার সঙ্গে ভাব কর্‌তাম, যদি সে আমায় ভালবাস্‌ত—আমি নিশ্চয় জানি সে আমায় না ভালবেসে থাক্‌তে পার্‌ত না—তবে আজ সে দাঁড়াত কোথা ?

"আমি আজ কাঁদচি। আমার মুখেই শুধু রক্ত উঠ্‌চে না, বুকও রক্তাক্ত হচ্চে। কিন্তু এইটুকু সুখে আছি আর এক জনকে কাঁদাচ্চি না।

"অভিশপ্ত জীবন আমার। কিন্তু তার জীবন অভিশপ্ত করে যা'ব কোন্ অধিকারে ?

"যা কিছু আছে, সবার চেয়ে প্রিয় সে। সব কিছু তার পায়ে ঢেলে দিতে পারি। সেই জন্যই কি তার সঙ্গে ছলনা কর্‌ব ? বল্‌ব, আমি তোমায় ভালবাসি, তোমায় আমার স্ত্রী হ'তে হ'বে ?

"তারপর ? হয় ত তাকে যক্ষ্মায় ধর্‌বে। আর যাদের জন্ম দিয়ে যা'ব পৃথিবীতে, তারাও জন্মাবে শুধু আমায় অভিশাপ দিতে।

"না, ডাক্তার বাবু, তা হয় না। তার চেয়ে এই ভালো। এই করেচি ভালো।

নীলা ! নীলা ! নীলাকে আমি ভালবাসি। বার বার ঐ নাম করে তৃপ্তি হয় না। বার বার ঐ কথা বলে তৃপ্তি হয় না।

"ডাক্তার বাবু, আমি মর্‌ব, কিন্তু তাকে মেরে রেখে যা'ব কেন ? আমি ভুগ্‌ব, কিন্তু তাকে ভুগ্‌তে দিব কেন ? এই কি আমার ভালবাসা ?

"তার চেয়ে এই অসীম যন্ত্রণাও ভালো।

"বলুন ডাক্তার বাবু, এই কি আমি ভালো করি নি ? এই কি উচিত হয় নি ? আমি রোগী হ'তে পারি। কিন্তু আমার মন ছোট নয়। আমার জগৎ ছোট নয়।"

"কুসুম ! তোমার মন যে ছোট বল্‌বে, তার মত ছোট দুনিয়ায় কেউ নাই, এ আমি তোমায় বল্‌চি।" ডাক্তার বাবুর চোখ শুষ্ক রহিল না। "তুমি দেবতা। তাই তুমি এত সহ্য কর্‌চ।"

"না ডাক্তার বাবু, আমি দেবতা নই। আমি জানি, আমি দেবতা নই। কিন্তু সে জন্য আমার মনে কোন আপ্‌শোষ নাই। আমি হ'তেও চাই নি। এই মাটির পৃথিবীতে মাটির মানুষ হয়েই দুদিনের সুখ চেয়েছিলাম। তা পূর্ণ হ'ল না।

"কিন্তু ডাক্তার বাবু, এতটা কষ্ট যে পেয়ে গেলাম, নিজেকে এতখানি বঞ্চিত যে কর্‌লাম, কি ফল পা'ব এতে ? পা'ব কি ? এ সমস্তই কি মিথ্যা ? আমি কি বোকার মত নিজেকে শাসন করে মরেচি ?"

"কখনো না, কুসুম, কখনো না। তোমার এত কষ্টের, এত সংযমের পুরস্কার তুমি পাবে।"

"কবে ? কোথায় ? কেমন করে পা'ব ?"

"পরলোকে।"

"হায় ! ডাক্তার বাবু, আপনিও পরলোক দেখালেন ? কিন্তু পরলোকের লোভ আমি কিছু করি নি ত। আমি নীলাকে ভালবেসেচি। এই মাটির পৃথিবীতে ভালবেসেচি। এই পৃথিবীতে আমি কিছু কর্‌তে চেয়েছিলাম। পরলোকে পেয়ে আমার কি হ'বে ? পরলোকে আমার বিশ্বাস নাই।"

"ডাক্তার বাবু !

"আমার যেন মনে হ'চ্চে, আমি ভাল হয়ে আস্‌চি। না ? আমার সমস্ত কষ্ট ইহলোকেই পুরস্কার আন্‌চে। না ?"

ডাক্তার বাবু অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিলেন ঃ

"ঘুমাও বাবা ; রাত বাড়্‌চে।"

"আজ খুব জোছ্‌না রাত। যেন উৎসব লেগে গেছে ! নীলার মুখ আমার বার বার মনে পড়্‌চে। সে এখন কি কর্‌চে, কে জানে !"

"ঘুমাও বাবা।"

"কিন্তু সত্যি বলুন, ডাক্তার বাবু, নীলা আমায় ভালবাস্‌তে পার্‌বে না ?"

"নিশ্চয় পারবে।"

"আমি জানি পারবে। তারপর তাকে বিয়ে করে বেশ মনের মত সংসার পাতা যা'বে। আর দেখুন, আমাদের সেই সংসারে আপনার জন্য বেশ বড় একটা স্থান থাক্‌বে।"

"কুসুম! ঘুমাবার চেষ্টা কর।"

"সমস্ত ছবিটা আমার মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌চে। আনন্দ হচ্চে। ...হাঁ হাঁ, নীলার মনের মত ছবি কিন্‌তে হ'বে। আমি বই ভালবাসি। একটা লাইব্রেরী কর্‌তে হ'বে। অনেক ঘর গৃহস্থালি...

"দেখ্‌বেন আপনি, আমরা আর দশ জনের মত হ'ব না।...দেশের কথাও ভাব্‌ব।"...

"ডাক্তার বাবু, ভাল হয়ে উঠেই এবার একটা আংটি গড়্‌তে দিব।..."

* * * * *

নয় দিন পরে কুসুম ডাক্তারের ঘরে মারা গেল।

মাঘ, ১৩২৯।

পর-নিন্দা

পর-নিন্দা নিশ্চয়ই ভাল নয়। অন্তত কেহই বলিবে না, ভাল। কিন্তু তবু পর-নিন্দার মত মুখরোচক জিনিষ জগতে দুটি নাই। ছোট বড় কে কবে পর-নিন্দা না করিয়াছে?

আমরাও কয়েক জন মিলিয়া সেদিন এক অনুপস্থিতকে লইয়া তাঁর শ্রাদ্ধ করিতেছিলাম। শুধু কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক মহলে নয়, তখন সর্ব্বত্রই লোকের মুখে আমাদের মত মধুর মন্তব্যগুলি ধ্বনিত হইতেছিল।

"এমন ভীরু কোথাও দেখি নাই।"

"একেবারে অপদার্থ।"

"আহা, বেচারা বউটি! সারাদিন রোগে একলাটি পড়ে ছটফট্ করে, অথচ তাকে দেখ্‌বার লোক নাই।"

"স্বামীর মুখ দেখ্‌বার জন্য পাগল, স্বামী কিন্তু অন্য বিয়ের আয়োজনে মাত্‌ছেন।'

"হৃদয়হীন!"

"আজকালকার ছেলে যে এমন হ'তে পারে তা কল্পনাও কর্‌তে পারি নি।"

"এ দিকে ত বেশ ভাল লোক বলেই মনে হয়—বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্—'

"রেখে দাও তোমার বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্—বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে ত ধুয়ে খাবে।"

"লজ্জার কথা কিন্তু।"

"তা আর বল্‌তে।"

এই ছিল প্রথম দিক্‌কার মন্তব্য। যে হতভাগ্য ব্যক্তিটির সম্বন্ধে

এই মধুর আলাপ, তাঁর নাম অচিন্ত্যকুমার সান্যাল—আমাদের কলেজে কাজ করিতেন। ভদ্রলোকের বয়স বেশী নয়—২৮।২৯ হইবে। বেশ সুস্থ অমায়িক লোক। শুনিয়াছিলাম ঘরে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী আছে, কিন্তু সেই স্ত্রীকে বিবাহের পর হইতেই কেহ দেখিতে পারে না। স্ত্রী স্বামীকে খুবই ভালবাসিতেন। কিন্তু স্বামীর মন না কি কিছুতেই উঠিত না, তিনি স্ত্রীর উপর অত্যাচার দেখিয়াও দেখিতেন না। স্ত্রী বেচারী গুমরিয়া গুমরিয়া মরিতেন। ক্রমে যেমন হইয়া থাকে, স্ত্রীর যক্ষ্মা হইল।

সুস্থ মানুষের উপর নির্দ্দয় ব্যবহার করিবার কারণ থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু রোগী, বিশেষ রোগিণীর উপর অত্যাচার মনকে সহজেই বিদ্রোহী করিয়া তুলে। যে সে রোগ নয়, যক্ষ্মা। আমরা শুনিলাম, অচিন্ত্যকুমার অবহেলায় বউটাকে মারিয়া ফেলিবার যোগাড় করিতেছেন। একে তখন আমাদের সকলের বয়স কম ছিল, রক্ত গরম, তার উপর প্রতিদিন নূতন নূতন সংবাদ আসিত—আমাদের সকলের চিত্ত জ্বলিয়া উঠিত। আমরা কষিয়া মনের সাধে তাঁকে গালাগাল দিতাম।

ব্যাপার এইখানেই শেষ হইল না। দিনে দিনে আরো ঘোর হইয়া উঠিল। শেষে উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। তখন আমাদের সকলের মুখে এক কথা। ছাত্রমহলেও ঐ কথা।

"শুনেছ ?"

"অনেক দূর গড়িয়েছে।"

"কেলেঙ্কারির কথা।"

"আদালতে নালিশ করেছে।"

"শোন নি বুঝি ? অচিন্ত্যের শ্বশুর তাঁর মেয়েকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা দেয় নি।"

"কি নিষ্ঠুর ! তারপর ?"

"ভদ্রলোক নালিশ করেছেন যে এরা আমার মেয়েকে মেরে ফেলতে চায়।"

"বেশ হয়েছে। আদালত থেকে একটা বড় শাস্তি দেয়, খুব খুসী হই।"

বস্তুত আদালতে নালিশ হইয়াছিল। আমরা প্রতিদিন কাগজ পাঠ করিতাম আর অচিন্ত্যের উপর আমাদের আক্রোশ বাড়িয়া উঠিত। তার মত জঘন্য মানুষ আর কোথাও নাই এ সিদ্ধান্তে পৌছিতে আমাদের বেশী দিন লাগে নাই।

এই সময়টা সত্য সত্যই অচিন্ত্য সান্যালকে আগুনের ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। আগে আমরা অসাক্ষাতে তাঁর সম্বন্ধে আলাপ করিতাম, একটু করুণা হইত। কিন্তু এখন আর করুণা অবশিষ্ট রহিল না। তাঁর সম্বন্ধে নির্দ্দয় হইয়া পড়িলাম এবং মনে করিলাম তাহাই সুবিচার। এত বড় অন্যায়কে কোন মতেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

অচিন্ত্য আমাদের নিকট অপমানিত রহিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন না। ছাত্র-মহলে তাঁর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একশেষ হইত। ইহা জানিতে পারিয়াও আমরা প্রতীকারের চেষ্টা করিতাম না। ভাবিতাম, ইহা উঁহার প্রাপ্য।

কিন্তু আশ্চর্য্য! এত উত্যক্ত হইবার পরও একদিন তাঁকে কারো বিরুদ্ধে নালিশ করিতে দেখিতাম না। তাঁর আচরণে বুঝা যাইত না তিনি বাস্তবিক দোষী কি না। একবার মনে হইত দোষী, অন্যবার মনে হইত নন। তাঁর মুখে হাসি লাগিয়াই ছিল। অথচ আমি হলফ্ করিয়া বলিতে পারি, এত ক্লান্ত বেদনাতুর মুখ আমি আর জীবনে দেখি নাই।

তারপর সব চেয়ে বড় ঘটনা ঘটিল, যা আমরা সকলেই কামনা

করিয়াছিলাম, অথচ যার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। অচিন্ত্য সান্যালের জেল হইয়া গেল, কি করিয়া বুঝিতে পারি নাই, কত দিনের তাও এখন মনে নাই। সে দিন আমরা বিশ্রামের সময় বসিয়া কলেজে বাস্তবিক বিজয়োল্লাস সম্পন্ন করিয়াছিলাম।

তারপর আস্তে আস্তে আমাদের মন হইতে অচিন্ত্য সান্যাল, স্ত্রীর উপর অত্যাচার, মোকদ্দমা, জেল—নিঃশেষে সব মুছিয়া গেল। কিছু মনে রহিল না। কলেজ যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। আমরা আসিতে লাগিলাম এবং পর-চর্চ্চা ও পর-নিন্দা করিলাম, কিন্তু অচিন্ত্য সান্যালের নহে।

ছয় মাস পর। আমি তখন পুরী যাইতেছিলাম। ষ্টীমার চলিতে আরম্ভ করিলে ঠিক অচিন্ত্যনীয়রূপে অচিন্ত্য সান্যালের সহিত দেখা হইয়া গেল। অচিন্ত্য প্রথম শ্রেণীর কেবিনের সাম্‌নে রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া নদীর দিকে ও পরে সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। সে আগের চেয়ে রোগা হইয়া গিয়াছে। মুখে সে হাসি আর নাই, বিষণ্ণ।

আমাকে সে দেখিতে পাইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। পা'ক্ বা না পা'ক্, তার জায়গা হইতে সে একটুও নড়িল না। কবে সে জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছে, কেন সে পুরী চলিয়াছে, আমি কিছু জানি না। সেই জানিবার ঔৎসুক্য বা আর কিছু, বলিতে পারি না, আমাকে কেবলই তার দিকে টানিতে লাগিল। মনে হইল, তার সঙ্গে গিয়া আলাপ করি। কিন্তু বিদ্বেষটা না কি অনেক দিনের, তাই সোজাসুজি তার কাছে যাইতে আপনা হইতে বিতৃষ্ণা জাগিয়া রহিল। আমি যাওয়া-না-যাওয়ার দোলায় পড়িয়া গেলাম।

সে নিজের কেবিনে চলিয়া গেলে আমি একবার প্রথম শ্রেণীর পাশ

ঘুরিয়া আসিলাম। দরজা খোলাই ছিল। তাতে দূর হইতে দেখিলাম একটি মেয়ে শয্যায় শুইয়া আছে, আর তারই মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে অচিন্ত্য। রমণীর মুখ আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না, তবু মনে হইল সুন্দরী। তখন মনে করিলাম, এ বেটা বউ না মরিতে মরিতেই বিবাহ করিয়াছে এবং প্রেমের অভিনয় করিতে পুরী চলিয়াছে। লোকটার উপর আবার ঘৃণা জাগিয়া উঠিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সূর্য্যাস্তের সময় আসিল। পশ্চিম গগন এক অপূর্ব্ব শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত আমাকে চিরকাল পাগল করিয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের উপর সূর্য্যাস্তের দৃশ্য বর্ণনা করিবার তুলি আমার হাতে নাই। তাহা মহৎ, তাহা উদার—মন ভরিয়া উঠে, প্রাণ জাগিতে চায়।

পশ্চিম আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কি যেন আমি পান করিতে চাহিতেছিলাম। মনে মনে বলিতেছিলাম, মরি, মরি! আর একটা লোক কখন যে নিঃশব্দে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমি তা টের পাই নাই। সূর্য্যের শেষ রশ্মি আকাশে মিলাইয়া গেলে সে বলিল, "যে চিত্রকর আকাশে দিনের পর দিন এমন ছবি এঁকে চলেছে তার মত যাদুকর কোথাও আছে কি?"

ফিরিয়া দেখিলাম অচিন্ত্য সান্যাল। সে বলিয়া চলিল, "মানুষ প্রাণপণ কত চেষ্টা করে সেই যাদুকরের নকল করতে। কিন্তু তার চেষ্টা চিরকাল অপূর্ণই থেকে যায়। এক বেলার একটা সূর্য্যাস্তও এমন করে আঁকবার তার ক্ষমতা নাই।"

সূর্য্যাস্তের শোভা অথবা তার করুণ-স্বর ক্ষণকালের জন্য আমার মনকে ভুলাইয়াছিল। তাই উত্তর দিলাম, "দরকারও নাই। মানুষ ত শুধু প্রকৃতিকে হুবহু ফুটাবার জন্যই নয়।"

সে কেমন এক রকম সুরে বলিল, "কে বল্‌বে? এত রকম কলার মধ্য দিয়ে মানুষ কোন্ কথাটা বল্‌তে চাচ্ছে, কাকে প্রকাশ করতে চাচ্ছে —"

বাধা দিয়া বলিলাম, "নিজেকে।"

"মানি। কিন্তু নিজেকে প্রকাশ কর্‌বার আধারটার কথা ভুলে যেও না ভাই। আমার মধ্যে যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যা সার্থক, তাই আমি ছবিতে ফুটিয়ে তুল্‌তে চাই। কিন্তু কেন চাই? কি দেখে চাই? প্রকৃতিকে নকল কর্‌বার আমার স্বাভাবিক ইচ্ছা—"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ছবি আঁক?"

সে কোন উত্তর না দিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। ক্ষণপরে দুই তিনটা ছবি লইয়া আসিল। ছবি সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত আনাড়ি, যদিও প্রকৃতির শোভা আমাকে সর্ব্বদাই মুগ্ধ করে। তবু মনে হইল ছবিগুলি ভাল লাগিতেছে। অনেক ছবি দেখিয়াছি, অনেক ছবি ভাল বলিয়াছি, কিন্তু তবু এই প্রথম একজনের ছবি দেখিলাম যাতে মন সত্যই খুসী হইয়া উঠে।

ঐ লোকটা ছবি আঁকিতে পারে! কেন জানি না, তার উপর আমার মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইল। মনে হইল, এমনতর ছবি আঁকিবার তার কোন অধিকার নাই। আমার চির-পরিচিত অচিন্ত্য সান্যালকে চিত্রকর অচিন্ত্য সান্যালরূপে কিছুতেই মিলাইতে পারিলাম না।

লোকটার দেখিতেছি গোপন করিবার প্রয়াস কোথাও নাই, অথচ ইহার আঁকা ছবি ত কোনখানে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

"কোন কাগজে তুমি ছবি পাঠাও না?"

"পাঠাই।"

"কই, তোমার নামে ছবি কোথাও দেখেছি বলে ত মনে হয় না।"

"আমি ছদ্মনাম ব্যবহার করি।"

"কেন?"—প্রশ্নটা অন্যায়, তবু করিলাম।

সে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "ছবি আঁকবার বাতিক আমার ছোট বেলা থেকে। সে কথা মনে করলে আমার পড়াশুনা কি করে হ'ল আমিই ভেবে পাই না [হাসিল]। কিন্তু ছবি ছাপাচ্ছি আমি অল্পদিন যাবৎ। তখন আমাকে নিয়ে হৈ চৈ চল্‌ছে। কাজেই আমাকে নাম ভাঁড়াতে হয়েচে।"

কি লোক! স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিয়াছে, মোকদ্দমা হইয়াছে, প্রেম করিয়াছে, জেলে গিয়াছে, ছবি আঁকিয়াছে। প্রিয়তমার মত ছবিকে সে সঙ্গী রাখিয়াছে। এত গোলমাল, বিদ্রূপ, হাসি, অপমান এবং চিত্ত-বিক্ষোভের মধ্যেও তার মধ্যকার তাপস মানুষটি চঞ্চল হয় নাই, তার ধ্যান ভাঙ্গে নাই। সমস্ত সে নীরবে সহ্য করে। স্বীকার করিতেই হইবে, মানুষটার মধ্যে ক্ষমতা আছে। অথচ মজা এই, সেজন্য তার একটুও অহংকার নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার সঙ্গের রমণীটি কে?"

"আমার স্ত্রী।"

ব্যস্। সব শেষ হইয়া গেল। মনের মধ্যে যে একটা কোমল ভাব জাগিতেছিল, জাগিতে পাইল না, অন্য ছবি জাগিয়া উঠিল। সুন্দর ছবি আঁকিয়া লোক ভুলাইলে কি হইবে? লোকটা যে নীচ, সন্দেহ নাই। চাহিয়া দেখিলাম, তার যেন আরো অনেক কথা বলিবার আগ্রহ রহিয়াছে, কিন্তু আমার আর শুনিবার প্রবৃত্তি রহিল না।

এইরূপে আমরা যাত্রা শেষ করিলাম, অচিন্ত্য সান্যালের আর কোন খোঁজ করিলাম না।

কয়েক দিন পরে একদিন বিকালে সমুদ্র-তীরে বেড়াইতেছি।

সাগরের একটা শক্তি আছে। এখানে আসিয়া সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত ছাড়া সাগরও আমার মনোহরণ করিয়াছে। সম্মুখে অনন্ত নীল জলের রাশি, ঢেউ আসিয়া তীরে আঘাত করিয়াছে, ছেলেমেয়েরা কলধ্বনি করিতেছে, হাসিতেছে, ভাসিতেছে,—এই সব দেখিয়া মনে কেমন এক ভাবের উদয় হইত। মনে হইত, মানব-জীবনে যা চলিতেছে তাই সব নয়। এর একটা অদূর দিক্ আছে যা সাগরের মত মহান্ ও গম্ভীর। বস্তুত সাগরের সংস্পর্শ মানুষকে একটু মহৎ করিয়া তুলে।

আমার হাতে কাজ ছিল না, মাথায় চিন্তা ছিল না, নিশ্চিন্ত আরামে সময় কাটাইয়া শরীর-মন সুস্থ হইল। মাঝে মাঝে অচিন্ত্যের সহিত দেখা হইত, বাক্যালাপ করিতাম না। তার কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম না, হাসি হাসি অথচ সেই চিন্তিত বিষন্ন মুখ।

সেই দিন বেড়াইতে আসিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়িল। দেখি, বেলাভূমিতে একটি তরুণী বসিয়া আছে, আর অচিন্ত্য তার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে—মা যেমন করিয়া তার রুগ্ন ছেলের দিকে তাকায়। বুঝিলাম, অচিন্ত্যের স্ত্রী। ইহাকেই ষ্টীমারে দেখিয়াছিলাম।

তরুণী বটে কিন্তু কি শীর্ণ, আর কি কাতর! এই কি অচিন্ত্য সান্যালের নব-পরিণীতা স্ত্রী? ইহাকে লইয়া প্রেম করিতে সে পুরী আসিয়াছে? এ যে মড়ার মুখ। এই মড়ার মুখ দেখিলে অতি বড় নির্দ্দয়ের চোখেও জল আঁসে।

অচিন্ত্যের স্ত্রী সুদূর-প্রসারিত সাগরের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তার সর্ব্বাঙ্গ খুব ভাল করিয়া ঢাকা, শুধু মুখটি বাহিরে রহিয়াছে। গায়ের কাপড়ের এক দিক্ পড়িয়া গিয়াছিল, অচিন্ত্য অতি যত্নে অতি সন্তর্পণে উঠাইয়া দিল। তার দৃষ্টি যেন বুভুক্ষিতের দৃষ্টি। তার চোখ দিয়া সে যেন সাগর, আকাশ, প্রকৃতির সব শোভা-সৌন্দর্য্য, অচিন্ত্যের

মুখ, পান করিয়া লইতে চায়। যেন মরিবার পূর্ব্বে সে পৃথিবীকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইতেছে, শেষ ভালবাসা বাসিতেছে।

এ যে রুগ্ন, এ ত সুস্থ মেয়ে নয়। অচিন্ত্য করিয়াছে কি? জানিয়া শুনিয়া একটা রুগ্নাকে বিবাহ করিয়াছে? বেচারা! তার উপর যত রাগই থাকুক্ না, এখন করুণা বোধ করিলাম।

তাদের দু'জনের টুক্‌রা টুক্‌রা কথাবার্ত্তা সমুদ্র-তীরের আর সব কিছু ছাপাইয়া আমার কাণে আসিয়া বাজিতেছিল।

"আলো কি চোখে বড় লাগ্‌ছে?"

"না।"

"কি ভাব্‌ছিলে, রেণু?"

"ভাব্‌ছিলাম আমরা পৃথিবীতে এসে মিথ্যা গোলমাল করে মরি। এত হৈ চৈ, এত ব্যস্ততা কিসের জন্য? বল্‌বে, প্রাণের জন্য। কিন্তু প্রাণই কি সব চেয়ে বড়? প্রাণের বড় কিছু নাই?"

"কি আছে?"

"হৃদয়।"

"সত্যি বল রেণু, আমি হৃদয়-হীন নই?"

রেণু প্রেম-নয়নে অচিন্ত্যের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি কোন দিন তোমায় হৃদয়-হীন মনে করি নি। আমার পরম দুঃখের দিনেও না। আর আজ মনে কর্‌ব? আজকার মত এত কাছে আর কবে তোমাকে পেয়েছি বল।"

"কিন্তু রেণু, আমার কি হ'বে?"

"তোমার ত কোন দোষ নাই।"

কেমন এক রকম মুখ করিয়া অচিন্ত্য বলিল, "তাই বা বলি কেমন করে?"

"বল্‌তে হ'বে না, আমি জানি।"

"তুমি সবটা জানো না।"

"আমি সব জানি গো। যা'বার আগে এই ক'টা দিন কেন তুমি বিষণ্ণ থেকে আমায় বিষণ্ণ কর্‌বে?"

"আমি ত বিষণ্ণ নই, হাস্‌চি।"

আমি অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তারা দু'জনে দু'জনকে লইয়াই বিভোর, আমার দিকে দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত করিল না। আমি ফিরিয়া গেলাম। সেদিন রাত্রে মনে হইল অচিন্ত্যের জীবন রহস্যময়, অতখানি কঠোর তার উপর আর না হইলেও চলে।

দিন সাতেক পরে অচিন্ত্যের সহিত দেখা হইল। সে দিন সে একা আসিয়াছে। বালুর উপর বসিয়া আছে। বলিলাম, "আজ যে একা।"

"আমার স্ত্রীর শরীর আজ একটু বেশী খারাপ।"

"তোমার স্ত্রী কি রুগ্ন?"

"রুগ্ন।"

"কি রোগ?"

"যক্ষ্মা।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, নয়? জেনে শুনে রুগ্নাকে বিয়ে করেছ?"

সে কাতর ভাবে আমার দিকে তাকাইয়া বলিল, "কার কথা বল্‌চ? রেণুর? ওই ত আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। তারপর আর বিয়ে করি নি। পুরীতে হাওয়া বদ্‌লাতে এনেছি।"

হায়, পর-নিন্দা এবং পর-চর্চ্চার বাসনা! এই লোকটাকে লইয়া আমরা কত রকম অসুখকর আলোচনাই না করিয়াছি। ইহার সম্বন্ধে কত কথাই না অত্যন্ত সহজে বিশ্বাস করিয়াছি। অথচ ইহাকে ভাল

করিয়া জানিবার চেষ্টা কেহ কোন দিন করি নাই। আজ জীবনে এই প্রথম তার সম্বন্ধে সব কথা জানিবার ইচ্ছা হইল। তাই বলিলাম, "কি রকম? আমরা যে জানি কষ্ট দিয়ে তুমি এতদিনে বউটিকে মেরে ফেলেচ। মোকদ্দমা হ'ল, এত কাণ্ড হ'ল, আর আজ—"

"মোকদ্দমাটা মিথ্যা নয়। তবে আমার জীবনে অনেক কিছু জড়িয়ে গেছে যা সত্য নয়, মিথ্যাও নয়,—ছাড়াবার উপায় নাই।"

"বল্‌বে কি সব কথা খুলে? তোমার যদি কষ্ট না হয় আর আপত্তি না থাকে, তবে আমি শুন্‌তে চাই।"

"আপত্তি?" তার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল। "না, আপত্তি কিছু নাই। বরং আমি আমার কথা অনেকের কাছেই বল্‌তে চেয়েছি, কিন্তু কেউ শুন্‌তে চায় নি। আগে থেকে অবিশ্বাস করে বসে রয়েছে। তুমি যদি শুন্‌তে চাও, শোনাব।"

ততক্ষণে সন্ধ্যার বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, সপ্তমীর চাঁদ তার মৃদু আলোতে সাগর, আকাশ ও বিস্তীর্ণ শুভ্র বালুতে একটা তরলতা ঢালিয়া দিয়াছে, ঢেউয়ের উপর মধুর জ্যোৎস্না নাচিয়া চলিয়াছে, নানা রকম গুঞ্জন ও স্বর স্থানটাকে রঙীন করিয়া তুলিয়াছে।

সেই অনন্ত অসীম নীল আকাশের তলে ও বিশাল বিপুল নীল সমুদ্রের ধারে অচিন্ত্য সান্যাল তার কাহিনী বলিতে লাগিল। বলিল,

"আমার সম্বন্ধে তোমাদের আলোচনা এক সময় খুব পেকে উঠেছিল। আমি জানি আমাকে নিয়ে তোমরা খুব আলোচনা কর্‌তে, আমার শ্রাদ্ধ কর্‌তে। তারপর সময় এল যখন তোমরা ও আমার ছাত্রেরা প্রকাশ্যে আমাকে অপমান কর্‌তে ছাড়্‌তে না।

"কিন্তু এও জানি আমাকে বাইরে থেকে বিচার করেছ। অন্য এক দিক্ থেকে বিচার করা যে যায় তা তোমরা জান্‌তে না। আমাকে

যত দোষ দিয়েছ, আমি ঘাড় পেতে স্বীকার করেছি, প্রতিবাদ করি নি। কি করে কর্‌ব? প্রতিবাদ করা সহজ ছিল না। বুঝানো সহজ ছিল না। এর মধ্যে আমার মা ছিলেন যে।

"রেণুর উপর অত্যাচার হয়েছিল, আর তারই ফলে তার এই যক্ষ্মা, এ কথা আমি কোনদিন ভুল্‌তে পার্‌ব না। দিনে দিনে কি বেদনা সে বুকে পুষে রেখেছিল, সে ইতিহাস কি আমি জানি না? তিলে তিলে সে যে এমন করে দগ্ধ হয়েছে, তা কি আমি জান্‌তাম না?

"জান্‌তাম, কিন্তু জেনেও কোন উপায় কর্‌তে পারি নি। অক্ষয়, এ অবস্থায় তুমি কোন দিন পড়নি। এ অবস্থা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আমি কলেজে আস্‌তাম, নিজের কাজ কর্‌তাম, ছাত্রদের কাজ কর্‌তাম, এমন কি ছবি আঁক্‌তাম, কিন্তু বুকের মধ্যে কি জ্বালা যে পুষে রাখ্‌তাম, কেউ জানে না। সে জ্বালার কথা বল্‌বারও উপায় ছিল না। হাসিমুখে আমাকে দেখাতে হ'ত আমি ঠিক আছি, আমি ঠিক চল্‌ছি। কিন্তু আমি ঠিক ছিলাম না। ঠিক থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

"আসলে গোলমালটা আমার সঙ্গে নয়, আমি নিমিত্তের ভাগী মাত্র। গোলমালটা মাকে আর রেণুকে নিয়ে। কোন একটা কারণে বিয়ের দিন থেকে রেণু মার বিষ-নজরে পড়ে যায় চিরদিনের জন্য। কারণটা আমি বল্‌ব না। কোন ছেলেই মায়ের নিন্দা করতে পারে না। মা যাই করে থাকুন, ভুলে যেও না তিনি সর্ব্বদাই আমার মা ছিলেন। সেখানে যুক্তি-তর্ক খাটে না, দরকার হয় না।

"প্রথমটা এক রকম চলে যাচ্ছিল। কিন্তু রেণু আমার গুম্‌রে গুম্‌রে দগ্ধ হ'তে লাগ্‌ল। অনেক বছরের অত্যাচারে রোগে পড়্‌ল। রোগ যক্ষ্মা বলে ধরা পড়্‌তেও দেরী হ'ল না। তখন থেকেই সমস্তটা বিশ্রী হয়ে উঠ্‌ল।

"মা আমাকে কিছুতেই রেণুর কাছে যেতে দিবেন না, প্রাণান্তেও না। তিনি একেবারে কড়া পাহারা বসিয়ে দিলেন। তুমি ভাই মাকে মনে মনে বিচার করতে যেও না। মার অন্যায় হয়েছিল হয় ত, কিন্তু মার হৃদয়টা দেখো। ছেলে তাঁর প্রাণ, ছেলের জন্য সব তিনি করতে পারেন। রেণু যদি তাঁর আদরের বউ হ'ত, তবু আমি জানি আমাকে তার কাছে যেতে দিতেন না। 'ও মাগো, যক্ষ্মা রোগীর কাছে না কি কেউ যায়?' 'আমার স্ত্রী!' 'হোক্ তোর স্ত্রী। তোর স্ত্রী কি তোর মার কথার চেয়ে বড়?'

"এ কথার পর চুপ করে থাক্‌তে হ'ত, বল্‌তে পারি না, মায়ের কথার চেয়ে স্ত্রীর দাম বেশী। বাস্তবিক, মার কাছে বউয়ের অনেক আগে ছেলে। বউ তাঁর কে? ছেলে তাঁর সব। আমি একবারও রেণুর কাছে যেতে পার্‌তাম না। বউ যদি তাঁর প্রিয় হত, তবু বরং আমার না গেলে চল্‌ত। কিন্তু—

"এই অবস্থা কি দারুণ বেদনা-দায়ক সহজেই বুঝ্‌তে পারবে। আমার এক এক সময় সমস্ত মন মায়ের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ত। আমার স্ত্রী! আমার রেণু! তার কাছে যেতে পারব না? তার পরম দুঃখের সময় তার কোন কাজে লাগব না? এ কি হ'তে পারে কখনো? তবে এত যে ভালবেসেছি সে কি মিথ্যা বেসেছি? পুরুষের অহংকার আমার কি নাই? কর্ত্তব্য কি আমার নাই?

"মা আমার চোখের কোণে বিদ্রোহের আভাস দেখ্‌লেই বল্‌তেন, 'আগে আমি মরি, তারপর যা খুসী তুমি কর'। সে এমন করুণ এমন কঠিন কথা যে আমি নিজেরই মরণ কামনা করতাম। কিন্তু আমি স্ত্রীর কাছে যেতে পার্‌তাম না, মার সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করতাম না। আমি কাপুরুষ হয়ে পড়েছিলাম। মা বল্‌তেন, 'মার চেয়ে স্ত্রীই বেশী হ'ল?'

"বিধাতা এতখানি দুঃখ দিয়েও সন্তুষ্ট হ'লেন না। তারপর আদালতের কেলেঙ্কারিটা ঘট্‌ল। বউয়ের অসুখ, তাকে ভালও বাসেন না—তা সত্ত্বেও মা রেণুকে বাপের বাড়ী যেতে দিবেন না। বেচারা ভদ্রলোক বার বার চেষ্টা করে বিফল হয়ে চটে গেলেন। 'কি, একজন স্ত্রীলোকের এত স্পর্দ্ধা! আচ্ছা, আমি আমার মেয়ে ঘরে নিয়ে আস্‌ব, আর বাবাজীকে একবার টের পাইয়ে দিব। তবে আমার নাম—' ইত্যাদি।

"বাবাজীকে টের পাওয়াতে অবশ্য তাঁর বেগ পেতে হয় নি। বাবাজী নিজের হয়ে সমস্ত দোষ কবুল করেছিল। কোন বিষয়ে প্রশ্ন তুলে নি। কারণ, মাকে সেই মোকদ্দমায় আমার জড়াবার কোন রকম ইচ্ছা ছিল না। আমার জীবনের এই একটা তৃপ্তি আছে যে মা জড়ান নি। চোট্‌টা আমার উপর দিয়ে গিয়েছিল।

"কিন্তু যার জন্য এত, সেই রেণু্ একেবারেই বাপের বাড়ী গেল না, বাপের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত কর্‌ল না। বাবাজী টের পেলেন বটে, কিন্তু ভদ্রলোক মেয়ে ঘরে নিয়ে যেতে পার্‌লেন না, চোখ মুছে ফিরে যেতে হ'ল।

"তারপর জেলে চল্লাম। মার দুঃখ ও অনুতাপের কথা ভেবে অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তবু প্রাণে কেমন একটা শান্তি পেয়েছিলাম। যত দিন জেলে ছিলাম, আমি জেলকে দুঃখ বলে মনে করি নি—একবারও নালিশ করি নি বা তর্ক করি নি, আমার জেলে আসা উচিত ছিল কি না। জেলে আমার নিশ্চয় আসা উচিত ছিল। আমার অপ-রাধের প্রায়শ্চিত্ত আমি কর্‌ব না ত কে কর্‌বে? আমার অপরাধ? আমার নয় ত কার? কে রেণুর এত দুঃখের কারণ হয়েছিল? কে রেণুকে ভুগ্‌তে দেখেও নিঃশব্দে বসে ছিল? কে মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার

করেছিল? তাঁকে চোখের জল ফেল্‌তে বাধ্য করেছিল? আমি নয় কি? সাজা আমার পাওয়া উচিত নয় কি? সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। আমি সন্তুষ্ট-মনে জেলে গিয়েছিলাম, সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। যা'বার সময় রেণুকে বলে গিয়েছিলাম, 'রেণু, চল্লাম, কিন্তু আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তোমার বেঁচে থাক্‌তেই হ'বে। আমার প্রায়শ্চিত্তের পর তোমার ব্যবস্থা করব।

"বিধাতাকে দোষ দিয়েছিলাম। কিন্তু জেল আমাকে রক্ষা করল। সে ত অভিশাপ নয়, সে যেন আশীর্ব্বাদ। জেলের পর সব দ্বন্দ্ব মিটে গেল। মা রেণুকে ক্ষমা কর্‌লেন। যে রেণুকে তার বাপের জন্য আরো বেশী করে দেখ্‌তে না পারার কথা ছিল তাকে আর দূর করে রাখ্‌লেন না। এ কেমন করে হ'ল, আমি জানি না। কিন্তু এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

"রেণুকে হাওয়া বদ্‌লাতে তাই সহজ হয়ে গেল পুরী আনা। রেণু জানে সে আর বেশী দিন বাঁচবে না, আমিও জানি। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের এ মিলন যে কি মধুর তা তোমরা কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

"রেণু যদি আরো আগে এম্‌নি করে আমাকে পেত আমিও তাকে পেতাম, যদি সে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হয়ে যক্ষ্মার গ্রাসে না পড়্‌ত, তবে অবসানটা সুন্দর হ'ত। কিন্তু সুন্দর অবসান আমার কপালে জুট্‌ল না। তবু আমি আপ্‌শোষ করি না।

"কেন করব? যদি রেণুর ও আমার মাঝখানের ব্যবধান না কাট্‌ত, রেণু যদি আমার মুখ না দেখে মর্‌ত, আর আমি সে জন্য চিরকাল দগ্ধ হয়ে মর্‌তাম, তবু আমার বল্‌বার কিছু থাক্‌ত না, আপ্‌শোষ কর্‌তাম না। কেন কর্‌ব? এখন ত করবার কিছু নাই। এই যা পেয়েছি ঢের নয় কি? এইটুকু পা'ব, আশা করেছিলাম কি? জানি, আমি মার

কাছে, রেণুর কাছে অপরাধী। জানি, আমি ক্ষমা পেয়েছি, ভালবাসা পেয়েছি, শান্তি পেয়েছি। আর কি চাই?

"জীবনের সব দান আমি পাই নি, পা'বও না। সে জন্য দুঃখ কর্‌বার কি আছে? হাজার হাজার লোক কি আমার চেয়েও বঞ্চিত নয়? তা ছাড়া জীবনের সব দান পা'বার যে আমি যোগ্য এ অহংকার আমার মনে নাই। আমি ভালবাসি, ছবি আঁকি, শান্তি পেয়েছি, এই ঢের।

"লোকে ভুল করে বুঝেছে, অপমান করেছে, অমানুষ মনে করেছে, তাতে আমার কি ক্ষতি? অক্ষয়, প্রশ্ন কর্‌বার অধিকার ত আমার নয়, আমার অধিকার হ'বার। একদিন আমাদের চিহ্নও পৃথিবীতে থাক্‌বে না। তখন এই দ্বন্দ্ব, এই কোলাহল, গ্লানি কোথায় থাক্‌বে? আজ যে অপরাধ ত্রুটি অনেকে অনেক বড় মন কর্‌ছে, সেগুলি কোথায় থাক্‌বে?"

অচিন্ত্য সান্যাল চুপ করিল। দেখিলাম, চাঁদের আলোতে তার চোখ চক্‌চক্ করিতেছে। আমার প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল উঠিয়া তাকে আলিঙ্গন করি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ আমি, উঠিলামও না, আলিঙ্গনও করিলাম না। চাঁদ মাথার উপর উঠিল, পথ নির্জ্জন হইয়া আসিল, ঢেউয়ের ছলছল, বাতাসের শন্‌শন্, কাণে আসিয়া লাগিল। বায়োস্কোপের ছবির মত অচিন্ত্য সান্যালের জীবনের ছবিগুলি আমার সাম্‌নে ঘুরিতে লাগিল। কলেজের সেই দিনগুলির কথা মনে পড়িয়া গেল, যখন তাকে নিয়া কত না আলোচনা করিতাম।

অচিন্ত্য হঠাৎ তীরের মত সোজা হইয়া উঠিয়া বলিল, "আজ চল্লাম ভাই। রেণু হয় ত জেগে বসে আছে।" সে চলিয়া গেল।

আমি বাসায় আসিয়া বাতি জ্বালিলাম। শুইতে যাইবার আগে ডায়েরীর পাতায় লিখিয়া রাখিলাম,—

"অচিন্ত্য সান্যাল আজ তার জীবনের কথা খুলিয়া বলিয়াছে। ট্র্যাজেডি নিশ্চয়ই। কিন্তু লোকটার বর্ণনা-শক্তিকে প্রশংসা করিতে হয়। আমি নিশ্চয় জানি, সে অনেক বাড়াইয়া বলিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া বলিয়াছে যে, সত্য বলিয়া ভুল হয়। তথাপি একটা শিক্ষা আজ পাইয়াছি। আর পর-নিন্দা করিব না।

"লোকটা একটু কাপুরুষ বৈ কি। রুগ্না স্ত্রীকে লইয়া এতখানি প্রেমের পরিণাম ভাবিয়া দেখিয়াছে কি? যে-সে রোগ নয়, যক্ষ্মা। শেষে ছেলে-মেয়েদের এই রোগ হইলে কাকে অভিশাপ দিবে? অচিন্ত্য সান্যালকে নয় কি?"

শ্রাবণ, ১৩৩১।

বিচার

সতীশ,

আমি জানি, আমাকে আজ এই চিঠি লিখ্‌তে দেখে অবাক্ হয়ে যা'বে। ভাব্‌বে, "কি নির্লজ্জ লোকটা! মুখের উপর বলে দিয়ে এলুম, আমি এমন লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি নে, তবু আমায় ত্যক্ত করতে আস্‌চে।" হাঁ, তোমায় আমি ত্যক্ত করব। একদিন তোমায় প্রাণের বন্ধু বলে ডাক্‌বার আমার অত্যন্ত অধিকার ছিল ত! জীবনের কতকগুলো দিন—খুব কম দিন নয়—তোমার সহবাসে কাটিয়েচি। আমি যা-ই হই সতীশ, সেই দিনগুলোর অক্ষয় সুধা আমার মনে সঞ্চিত হয়ে রয়েচে, তাদের ভুল্‌তে পারি নি কোন মতে। আর সেই জন্যই তোমায় আমার কাহিনী শোনাতে চাই। তোমাকে ধৈর্য্য ধরে আগাগোড়া শুন্‌তেই হ'বে, তারপর বল্‌তে হ'বে আমি যা করেচি, তার মধ্যে অন্যায় কোথায়। কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি কখনো মনে কোর না যে অপরাধ করে আমি তোমার কাছে বা জগতের কাছে কৈফিয়ৎ রেখে যেতে চাই। মোটেই না। বরং আমি মরবার সময় পর্য্যন্ত এই সান্ত্বনা নিয়ে মরতে চাই যে, সংসারে আমি কোনদিন কারো কাছে মাথা হেঁট করি নি, ক্ষমা চাই নি।

হাঁ, আমি আমার স্ত্রী নিস্তারকে ত্যাগ করেচি এবং নীলিমাকে বিয়ে করে ঘরে তুলেচি। আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়্‌চে তোমার মুখ, অল্প দিন আগে যে দিন তুমি এসে আমায় এ-কাজ করতে নিষেধ

করেছিলে। তুমি বলেছিলে, "মোহন, তোমার কাছে বন্ধুত্বের দাম একটুও কি নেই?"

"অনেক দাম।"

"তবে আমার বন্ধু হয়ে তুমি স্ত্রীকে বিনা দোষে ছাড়্চ কেন? বন্ধুর কথা রাখ, এমন কাজ কোর না।"

আমি বল্লুম, "বন্ধুর কথার চেয়েও সত্যকে বড় জিনিষ বলে মনে করি, তাই বন্ধুর কথা রাখ্তে পার্ব না, মাপ করো।"

এই কথায় সে দিন তুমি অত্যন্ত অপমান বোধ করেছিলে। আমার সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি না করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলে, তুমি আমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখ্বে না এবং আমাকে ঘৃণা কর্‌বে।

এই কথা বলে তুমি যখন চোখ রক্তবর্ণ করে একেবারে ষ্টেশনে রওনা হ'লে, আমার দিকে ফিরেও তাকালে না, তখন তোমায় মনে মনে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলুম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিলুম যে তুমি অন্ধ।

একটা মানুষকে এত সহজে বিচার করা যায় কি সতীশ? তুমি বোঝাবার অবসর দিলে না, আমার কথা শুন্‌লে না, একেবারে সরাসরি বিচার কর্‌লে, "তুমি অন্যায় কর্‌চ।" হয়ত করেচি। হয়ত করি নি। যদি করে থাকি, তা অন্যায় বটে, অসত্য নয়,—তার মধ্যে অসত্য কিছু ছিল না, আর মনে হয় অসুন্দরও কিছু ছিল না। সে অন্যায়ের জন্য আমি অনুতপ্ত নই।

এ পর্য্যন্ত পড়ে তুমি হয় ত মনে মনে বল্‌বে, "লোকটার হৃদয় কি পাষাণ হয়ে গেছে? অমন পতিব্রতা সুন্দরী স্ত্রীকে বিনা দোষে পায়ে ঠেলে অন্যকে নিয়ে ঘর কর্‌চে, আর অনায়াসে বল্‌চে, আমি অসুন্দর কিছু করি নি, আমি অনুতপ্ত নই। উঃ!" কিন্তু না না, চিঠিটা মুড়ে এখনি ফেলে দিও না, শেষ পর্য্যন্ত শুনে যা ইচ্ছা কোর।

নিস্তারিণী পতিব্রতা, এ কথা আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। তার ঐকান্তিক সেবা, ভক্তি ও প্রেমে আমার জীবন কত মধুময় হয়ে গেছে, তা শুধু আমিই জানি। ভেবেছিলুম সারাটা জীবন বুঝি এম্‌নি আনন্দে কেটে যা'বে।

কিন্তু সেই দিন রাতে শুতে গিয়ে দেখ্‌লুম, নিস্তার বিছানায় নেই। কোথায় গেল? রাত হয়েচে, এখনো এলো না কেন? ভাব্‌তে ভাব্‌তে ছাদে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

জ্যোৎস্নামাখা সুন্দর রাত। অ', এতক্ষণ আমার মন ছিল কোথায় যে এমন রাত ভুলে ছিলুম? ছাদের আলিসার উপর দুই কনুয়ের ভর রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কথাই ভাব্‌তে লাগ্‌লুম! তখন মনে হ'ল প্রিয়তমাকে এ সময়ে পাশে চাই। যার সন্ধানে এসেছিলুম, সে জ্যোৎস্নার চেয়েও বড় হয়ে গেল।

আমি ডাক্‌লুম, "নিস্তার, নিস্তার।"

সাড়া নেই।

এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখি ছাদের এক কোণে দেওয়ালে গা মিশিয়ে দিয়ে কে কাঁদচে। আমার নিস্তার কি? নিস্তারই ত। কিন্তু ও কাঁদচে কেন? আর এই বুক-ফাটা কান্না? আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। এমন জ্যোৎস্না রাতে কেউ কাঁদতে পারে? আমার প্রিয়া যে সে কাঁদতে পারে? কিসের এ বেদনা?

আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, আস্তে তার মাথার উপর হাত রেখে ডাক্‌লুম, নিস্তার! বল্লুম, "কাঁদচ কেন? কাঁদবার রাত ত এ নয়। কেন কাঁদচ? কি দুঃখ পেয়েচ মনে? উঠে এস।..."

সে শিউরে উঠ্‌লে। নিজেকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে বল্লে, "ছুঁয়ো না, ওগো, আমায় তুমি ছুঁয়ো না।"

কেন, কি হয়েচে? না ছোঁবার এমন কি ঘটনা ঘট্‌ল? মনে দুশ্চিন্তা দেখা দিল। বল্লুম, "কেন নিস্তার, কি হয়েচে?. রাগ করেচ কি?.."

সে কথা শেষ হ'তে দিলে না, ভাঙ্গা গলায় বল্লে, "না, না, না। তুমি আমায় ছুঁয়ো না।"

আমি তাকে মনে মনে ক্ষমা কল্লুম। বল্লুম, "আচ্ছা, তুমি যখন চাইছ না, ছোঁব না।...এমন রাতে তোমায় যে জড়িয়ে ধর্‌তে সাধ যাচ্ছিল, সখি।...তা ওখানে বসে কান্না কেন? উঠে এস, আমার পাশে দাঁড়াও, নিস্তার।"

সে উঠে এল না, আমার কাছে দাঁড়াল না। তাকে কত প্রিয় নামে ডাক্‌লুম, কত আদরে ও সান্ত্বনায় স্বর ভিজিয়ে দিলুম,—জ্যোৎস্নার মায়া আমায় পেয়ে বসেছিল,—কিন্তু কোন ফল হ'ল না। সে নড়্‌ল না।

শেষ কালে সে আর থাক্‌তে পার্‌লে না। "ভগবান্!" বলে আমার পায়ের কাছে বাণাহতা হরিণীর মত লুটিয়ে পড়্‌ল।

আমি যত্নে, ব্যস্তে তাকে কোলে তুলে নিলুম। ভাব্‌লুম, কি অনর্থ ঘটেচে?

সে চোখ মেলে চেয়েই বল্লে, "ছেড়ে দাও আমায়, ছেড়ে দাও, নইলে আমি মরে যা'ব।"

মরে যা'ব? কি এ হেঁয়ালি? কেন এ হেঁয়ালি? মনে মনে বিরক্তি ঘনিয়ে এল। মন আমার আহত হ'ল। সরে এসে আলিসার উপর দিয়ে দূর আকাশ ও জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। ওদিকে নিস্তার তার বুক-ফাটা কান্নাটাকে বধ কর্‌তে থাক্‌ল।

আকাশে মেঘ দেখা দিল। নিজের চিন্তার মধ্যে এমন ডুবে গিয়েছিলুম যে, কখন চাঁদ ডুবে গেল, আকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, বুঝ্‌তে পারি নি। নিস্তারের কথায় প্রথম চমক ভাঙ্‌ল। যখন চাইলুম, তখন নিস্তারের মুখ আর দেখা যাচ্ছে না।

"ভগবান্, কেন আমায় এ শাস্তি দিলে? কি পাপ করেছিলুম তোমার কাছে যে আমার এ সুখ তোমার সইল না।..."

মর্ম্মন্তুদ বিলাপ। আমি যে কাছে ছিলুম, সে হয় ত জান্‌তে পারে নি।

যখন তার কথা ফুরিয়েচে বলে মনে হ'ল, অন্ধকারে আবার তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম। করুণায় কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য কোমল করে বল্লুম,

"মিনতি করে বল্‌চি, নিস্তার, কি তোমার বেদনা, কেন বেদনা, জান্‌তে দাও। ও রকম কেঁদে আমায় ব্যথা দিয়ে লাভ কি?"

"তুমি আমার স্বামী, আজ যদি তোমায় না বলি, দু'দিন পরে আপনা হ'তেই জান্‌তে পার্‌বে। তোমায় আমি ছলনা কর্‌ব না। কিন্তু ওগো, একটু ধৈর্য্য ধরে থাক না?..."

বিস্মিত হয়ে দেখ্‌লুম তার সুরের মধ্যে কান্নার আভাস নেই। বোধ হয়, স্থির হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েচে। অন্ধকারে তার দু'চোখ ঝক্‌ঝক্ কর্‌চে।

আমি ব্যথিত হ'লুম। বল্লুম, "স্বামীর অধিকারে নয়, সত্যি সত্যি বন্ধু বলে দুঃখের ভাগ নিতে দাও। তোমার দুঃখ ত আমারো দুঃখ।"

তার দু'চোখ জ্বলে উঠ্‌ল। "স্বামীর অধিকার নয় কেন?...যে অধিকার তোমার চিরকালের..."

"তুমি তাই মনে কর?"

"না। যদি বা আগে মনে কর্‌তুম, এখন আর করি নে। বুকে হাত দিয়ে দেখো ত, পরীক্ষা করে দেখো ত, এই অধিকারের অহংকার তোমার

রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কি না। তোমার কাছে আমি তোমার চিরকালের স্ত্রী নই, কিন্তু তুমি আমার চি-র-কা-লে-র স্বামী।"

"মিছে কথা।"

"মিছে কথা? তুমি পুরুষ মানুষ, এটাও তবে মিথ্যা?"

সে দিন তার যে মূর্ত্তি দেখ্‌লুম, ভুল্‌বার নয়। বিদ্রোহী ঝড়ের মূর্ত্তি, আমি স্তব্ধ হয়ে ভাব্‌লুম, কেন এ বিদ্রোহ? কিসের জন্য এ বিদ্রোহ? কার বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ? নিজের? স্বামীর? ভগবানের?...

কিন্তু ভাব্‌তে দিলে না, সমস্ত ভাবনা ডুবিয়ে দিয়ে তার তীক্ষ্ণ স্পষ্ট স্বর বেজে উঠ্‌ল। "শোন তবে। শুন্‌বে? শুনে সহ্য কর্‌তে পার্‌বে? আমাকে চিরকালের স্ত্রী বলে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে? আমার কুষ্ঠ হয়েচে।"

আমি আঁতকে উঠ্‌লুম। হয় ত নিজের অজ্ঞাতে এক পা পিছিয়েও এলুম। বল্লুম, "তোমার কুষ্ঠ?"

সে বিদ্রূপের সুরে বল্লে, "হ্যাঁ গো হাঁ, এতে আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই।"

তার কথা না বুঝ্‌তে পেরে আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। সে তিক্ত হাসি হেসে বল্লে, "বুঝ্‌তে পার্‌চ না?.. সন্দেহ হচ্চে?...কিন্তু আমাকে সন্দেহ কর্‌বার কিছু নেই। এ রোগ আমাদের বংশগত।... কিন্তু এখন তুমি বল্‌বে না কি আমি তোমার চিরকালের স্ত্রী?"

সতীশ, তখনকার আমার মনটাকে তুমি যদি একবার দেখ্‌তে পেতে!...এই কুষ্ঠ রোগী নারীকে নিয়ে আমার এ জীবনের বাকী দিনগুলিকে ব্যর্থ করে দিতে হ'বে? স্ত্রী? এর সঙ্গে ঘর কর্‌তে পারি, বন্ধুত্ব কর্‌তে পারি, আর সব পারি,—কিন্তু এ আমার সন্তানদের মা হ'বে? সেই সন্তানেরা বিনা দোষে এই রোগে ভুগ্‌বে এবং আমায় অভিশাপ দিয়ে যা'বে? কেন এ অদৃষ্টের পরিহাস?...চিরকালের স্ত্রী? রক্ষা কর!

আগে ইহকালের স্ত্রীর হাত থেকে মুক্তি পাই, তারপর চিরকালের স্ত্রীর কথা ভাবা যা'বে।

কিন্তু বল্লুম ত, স্বীকার কর্‌লুম ত তার কাছে, কোন অবস্থাতেই আমার মন তাকে চিরকালের স্ত্রী বলে মান্‌তে লজ্জা পা'বে না। তখন জান্‌তুম না কিছু, তবু স্বীকার করেচি। অঙ্গীকারকে রাখি কি করে? হায় ভগবান্, কেন আমায় এ পরীক্ষায় ফেল্লে? ··· কিন্তু মনে করে দেখো, মোহন, মনে করে দেখো, কি গভীর ভালবাসা ঐ নারীর তোমার জন্য। মনে করে দেখো, কত হাসি, কত সুখ, কত কথা, অপরূপ রসে জমা হয়ে আছে হৃদয়ের ভাণ্ডে তোমাদের। সে কি এত তুচ্ছ? সে কি মায়া?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলুম। আমার কপাল দিয়ে দর্‌দর্ করে ঘাম ঝর্‌ছিল। তারপর দূর অন্ধকার আকাশের দিকে একবার তাকালুম। তারপর এগিয়ে এসে বল্লুম,

"নিস্তার!"

"কি বল্‌চ?"

"তুমি আমার চি-র-কা-লে-র..."

ভেবেছিলুম অকম্পিত কণ্ঠে এই কথা বল্‌ব, কিন্তু গলার স্বর কেঁপে গেল। বুকখানায় একটা হাহাকার ভরে উঠ্‌ল। সেইজন্য জোরে তার একখানা হাত ধর্‌লুম, অসমাপ্ত কথা সমাপ্ত কর্‌লুম,

"হাঁ, তুমি আমার চিরকালের স্ত্রী।"

আমি আরো বল্‌তে যাচ্ছিলুম। কিন্তু ভাব্‌লুম এর চেয়ে আর কি বেশী বলা যায়?

কিন্তু এত বড় একটা কথা যাকে বল্লুম, আমার পাশের সেই রমণীর কি বল্‌বার মত কথা একটাও নেই? সে চুপ করে থাকে কেন?

সে যেন তার হৃদয়ের অতল তলে তলিয়ে গেছে। সে যেন নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে না। নিস্তার স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বসে বসে অনেক রাত হয়ে গেল। সে রাতে আর জ্যোৎস্না উঠ্‌ল না। কিন্তু আকাশে মেঘের গুম্ গুম্ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। হঠাৎ বেশ গরম হাওয়া ছুট্‌ল। বৃষ্টি হ'বার আশঙ্কা হ'ল, তবু হ'ল না। ...কিন্তু এত পাশাপাশি দু'টি মানুষ কি সারাটা রাত চুপ করে বসে থাক্‌তে পারে?

আমি বল্লুম, "রাত অনেক হ'ল, নিস্তার। শুতে চল।"

"চল। কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হ'বে।"

"কি?"

"এমন কিছু কঠিন কথা নয়।"

"শুনি না?"

"আজ থেকে পৃথক্ বিছানায় শোব।"

আমি হাস্‌লুম, "এ-ই। আচ্ছা, সে হ'বে। আজকের রাতটা ... "

"না, না, কোনমতেই না। আজকের রাত থেকেই।"

পর দিন সকাল বেলা। গত রাতের কথা ভাব্‌ছিলুম। কি কঠিন পণ কর্‌লুম জীবনে! অকারণ বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠ্‌ল। একটা যে বড় কিছু কাজ করেচি, মনে হ'ল না। তৃপ্তি পেলুম না।

মনকে বোঝাতে চাইলুম, কি আশ্চর্য্য! এটাকে ত্যাগ বলে মেনে নাও না, শান্তি পা'বে। মন বল্লে, তুমি ত্যাগ করেচ কোথায়? কিসে তোমার অহংকার হ'বে?

কাল রাতে নিস্তারকে যেমনটি দেখেচি এ জীবনে আর তেমনটি

দেখি নি। ঐ কি আমার সে নিস্তার যাকে কোমলতা ও নম্রতার প্রতিমূর্ত্তি ছাড়া কিছু ভাব্‌তে পারি নে? এত তেজ কোথা ছিল? কোথা থেকে এল? কোথা পেলে সে নিজের জ্বালা প্রকাশ করার এ ক্ষমতা? ও বিদ্রোহ কর্‌তে পারে? এ যে ভাব্‌তে পারি নি কোন দিন। ওর এই নূতন রূপ আমায় মুগ্ধ করেছিল, বার বার ধ্যান কর্‌ছিলুম সেই রূপ। ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্চিল ওর সতীত্ব নিস্তেজ সতীত্ব নয়। দরকার হ'লে ও ঠিক সময়ে জ্বলে উঠ্‌তে জানে।

কিন্তু আজকের নিস্তারিণীর সঙ্গে কালকের নিস্তারিণীর অনেক তফাৎ। এই সকাল বেলায় তার চঞ্চল চলাফেরার মধ্যে যত বার তাকে দেখ্‌লুম তাকে তার সেবা, ভক্তি ও প্রণামের মধ্য দিয়েই দেখ্‌লুম। যত বার সে কাছে এল, তার মধুর হাসি দিয়ে চোখের ভাষায় যেন এই কথাই বল্‌তে চাইলে, "আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী বই কিছু নই।" আজকে ওকে দেখে কে বল্‌বে কাল ও অত কাণ্ড করেছিল? কে বল্‌বে ও রকম কিছু কর্‌বার ওর ক্ষমতা আছে?

স্নানের সময় তোয়ালে হাতে দিতে দিতে নিস্তার হঠাৎ বল্লে, "কাল রাতে যা বলেচ তা কি প্রাণের কথা?"

"তবে কি বানিয়ে বলেচি, মনে কর?"

"হাঁ।"

আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। সেখানে হাসির আভাস দেখ্‌লে বুঝ্‌তুম, আমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌চে,—ক্ষমা কর্‌তে পার্‌তুম। কিন্তু ঠাট্টা ত এ নয়। মুখ গম্ভীর করে বল্‌চে, হাসি নেই। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলুম।

"নিস্তার, তুমি আমায় অবিশ্বাস কর?"

"না।"

"আগে হয় ত কর্‌তে না, এখন কর্‌তে আরম্ভ করেচ। ভেবেচ, হাতের কাছে ছুতো আছে, যখন খুসী বিমুখ হয়ে দাঁড়া'ব। কিন্তু জেনে রাখো, পুরুষের কথার একটা দাম আছে। তুমি মিথ্যা ভয় পাচ্চো।..."

সে দিন খাওয়ার পর ভাব্‌লুম, নিস্তারের এক দিকের দুর্ব্বলতা ধরা পড়েচে, আর তার স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিয়েচি, এতে আমার খুসী হওয়া উচিত। কিন্তু মন ত খুসী হয় না।

সতীশ, নিস্তারিণী যা'বার সময় তার ডায়েরীখানা আমার হাতে দিয়ে গেছে। তখন ত জান্‌তুম না তাকে কত ভুল বুঝেছিলুম। তার মনে যা বেদনা ও দ্বন্দ্ব ছিল শুধু তার অন্তর্য্যামী জান্‌তেন, অন্তর্য্যামীকে সে সব নিবেদন করেচে।...এবার নিস্তারিণীর ডায়েরীটা পড়, মনে রেখো সে চলে যা'বার পর এ আমি পেয়েচি, আগে নয়।

নিস্তারিণীর ডায়েরী

২৫ বৈশাখ, ১৩২৩। রাত্রি।

.. ডায়েরী লেখাটা আমার সখও বটে, খেলাও বটে। বেশ লাগে। কোন বাঁধন নেই, যখন খুসী যা খুসী লিখি।...

এর অনেক গুলি পাতা আমার স্বামীর কথায় ভরে গেছে। তিন বৎসরের বিবাহিত জীবন! লিখ্‌বার কথা ত কম নেই। লিখে আর ফুরাতে চায় না। ...

ছোট একটি ঘর বেঁধে জগতের এক প্রান্তে স্বামী আর আমি, আমি আর স্বামী। জীবন যে এত মিষ্টি, জীবনে যে এত মধুমাখা অবসর আছে, কে জান্‌ত! শত শতবার, জন্ম জন্মান্তর, এম্‌নি জীবন পেতে ইচ্ছা হয়। জন্মান্তর আছে কি না জানি নে। যদি থাকে এই ঘর, এই মাটি, এই

আকাশ, এই মানুষদের, এই আমার স্বামীকে আবার আমি ফিরে পেতে চাই। ..

১৩ শ্রাবণ, ১৩২৩। রাত্রি।

উঃ, বাইরে অন্ধকার। আর কি বিষ্টি নেমেচে আজ! কেন জানি নে এই শ্রাবণের ধারাকে আমার মাঝে মাঝে বড় ভয় করে। অকারণে কান্না পায়। একটু আগে গুণ গুণ করে গাইছিলুম, 'মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী। ফাটি যাওত ছাতিয়া।' ...

আজকে সকালে কলেজ পাশ করা একটি মেয়ে এসেছিল বেড়াতে। অদ্ভুত তার কথাবার্ত্তা। এসেই শুধালে, "আচ্ছা, আপনার জীবনটা কি খুব সুখময়, খুব আনন্দময়?"

শোন কথা! স্বামীর অনাবিল প্রেমের মধ্যে ডুবে থেকে যদি সুখ না হয়, তবে সুখ হ'বে কিসে? আমি বল্লুম, "কেন, বলুন ত?"

"জান্‌তে সাধ হয়েচে।"

আমি হেসে মাথা নাড়্‌লুম।

সে একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে, "বড় কাজ, বড় কথা, পুরুষদের জন্য বলে পুরুষরা অহংকার করে মরে। মেয়েরা কি শুধু স্ত্রী হ'বার জন্য, মা হ'বার জন্য তৈরী হয়েছিল?"

"হ'লেই বা ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি? আপনি বুঝ্‌চেন না ক্ষতি?"

"কিন্তু স্ত্রী হওয়া সহজ নয়। মা হওয়া আরো কঠিন।"

সে চম্‌কে উঠ্‌লে। আমার কাছে সে এ কথা শুন্‌বে বলে আশা করে নি। বল্লে, "তা হ'বে। কিন্তু এটা আমি বুঝ্‌তে পারি নে দেশের সব মেয়েকে কেন স্ত্রী ও মা হ'তে হ'বে। আর কি কিছু তারা হ'তে পারে না? একবার পরখ হোক্ না।"

আমি চুপ করে রইলুম। ভাব্‌লুম, এর উত্তরে কি বলা যায়?

সে আবার বল্লে, "শুধু পুরুষ মানুষকে সবটুকু সুযোগ সুবিধা দিলে চল্‌বে না। মেয়েদের মনেও বড় হ'বার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুল্‌তে হ'বে। তাদেরও অনেক কিছু কর্‌বার অধিকার আছে।"

এম্‌নিতর অনেক কথা সে বল্লে যা মনকে নাড়া দেয়। এই বাদল অন্ধকারে তার কথাগুলো আমার কাছে ফিরে ফিরে আস্‌চে।

১ মাঘ, ১৩২৩। রাত্রি।

বেশ শীত পড়েচে। শীতটা আমার ভাল লাগে। চারি দিকে কেমন একটা কৃশতা দেখা দিয়েচে। এ যেন তপস্যার কৃশতা। সমস্ত পৃথিবী যৌবনের জন্য তপস্যা কর্‌চে, উন্মুখ হয়ে উঠেচে। বসন্তে তার সেই তপস্যা সার্থক হয়ে উঠ্‌বে।...

দিনের মধ্যে আমি যত মোহনের কথা ভাবি মোহন কি তত ভাবে? বোধ হয় ভাবে না। কত রূপে কত ভাবে তাকে মনের মন্দিরে বসিয়ে পুজো করি; সে কি তা টের পায়? স্বামী! কিন্তু ও কথাটা আমার ভাল লাগে না। ওর চেয়ে বর কথাটা অনেক মিষ্টি! স্বামী, পতি, এগুলোর মধ্যে একটা অহংকারের দাবী আছে। দাবী কেন? সবই ত দিয়েচি।...বরের মধ্যে নেই।...আচ্ছা, সতী বলে আমার মনে কোন দিন গর্ব্ব হয় না কেন?

ভালবাসি!...কাকে ভালবাসি? মোহনকে? তার শরীরকে? তার আত্মাকে? জানি নে। কিন্তু আরো ভাল বাস্‌তে ইচ্ছা হয়। আরো ভালবাসা পেতে সাধ হয়।...মোহন আমায় ভালবাসে না হয় ত, মুখে বলে বাসি, বাসি। না, না, এই যে আমার অন্তরের মধ্যে টের পাচ্চি তার ভালবাসা। সে ভালবাসে। আমায় ভালবাসে। মন আমার অন্তর্য্যামী। মন জানে, সে ভালবাসে।...কিন্তু এ ভালবাসা টিঁক্‌বে

কি? চিরকাল ভালবাস্‌বে কি? কত কাল বাস্‌বে?…ওর ভালবাসা হারা'ব, এ কথা মনে কর্‌তেও আমার সমস্ত জীবন বিস্বাদ হয়ে যায়।

২১ ফাল্গুন, ১৩২৩।

বসন্ত এসেচে। পৃথিবীর একান্ত তপস্যা সার্থক হয়ে উঠেচে।… চারিদিকে কচি কচি পাতা দেখে কচি ছেলের মুখ মনে ভেসে উঠে।

আর কত দিন এ চল্‌বে? এত কাল ত স্ত্রী হয়ে কাটালুম। মা হ'বার সময় কি এখনো আসে নি? এম্‌নি করেই কি আমার সারা জীবন কাট্‌বে? মা হওয়া অদৃষ্টে কি জুট্‌বে না?…এ চিন্তা আমার মনে অনেক দিন এসেচে। তাড়িয়ে দিয়েচি। মোহন ত হেসে উড়িয়ে দেয়, "হ'বে গো হ'বে, এত ব্যস্ত কেন?" আর যা বলে লেখা যায় না। কত রকম কথা যে জানে!

কবে হ'ব মা আর? বিয়ের পর চার বছর কেটে গেল। …ভয় হচ্চে, শেষ পর্য্যন্ত মা হওয়া বুঝি কপালে ঘট্‌ল না।…

না, না, ভগবান্, বিরূপ হ'য়ো না।

গাছে গাছে এই কচি পাতার দিনে, ধরণীর এই উৎসবের ক্ষণে, কোলে একটি খোকা পেতুম যদি, কি খুকী!

১ বৈশাখ, ১৩২৪।

আর এক বছর চলে গেল। এই নতুন বছরে পুরাণো জীবনে কোন্ নতুন স্বাদ পাবার আশা মনে জেগে জেগে উঠ্‌চে? হায় গো, ছেলে কোলে পা'বার এত সাধ বলেই কি কোল আর কিছুতে ভর্‌চে না?…ওগো বিধাতা, কেন আমার মনে হঠাৎ এত মা হ'বার ইচ্ছা দিলে? দিলে ত সে ইচ্ছা পূরণ কর্‌লে না কেন?

মোহন কি সন্তান চায় না? সে যেন সর্ব্বদা খুসী হয়ে আছে, কোন

অভাব নেই। আর আমি অভাগী সন্তান পা'বার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে মরচি। পেটে সন্তান ধরে ভুগ্‌ব ত আমি, তবু চাই। আরও কি ভাবে?...

৩১ বৈশাখ, ১৩২৪।

কাল একটা নতুন বই পড়্‌ছিলুম। বাংলায় এমন ধারা বই আর পড়ি নি। স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে লেখা। আজকাল ঐ বিষয় নিয়ে দেখ্‌চি বেশ লেখালেখি চল্‌চে। এক জায়গায় বল্‌চে, নারী পুরুষের দাসী নয়,—এ কথা মেয়েদের আগে বুঝ্‌তে হ'বে, পুরুষ মানুষ বুঝ্‌লে কোন লাভ নেই।

দাসী! কোন পুরুষ মানুষের মুখে ও কথা শুন্‌লে আমি মান্‌ব না।... আমি মোহনের দাসী বৈ কি। কিন্তু তা বলে মোহন ও কথা বল্‌বে? বলুক্ দেখি এসে! নিশ্চয় প্রতিবাদ কর্‌ব। রাগ কর্‌ব। কেন সে বল্‌বে? আমি এক শ' বার বল্লেও সে একটি বার বল্‌তে পা'বে না।

পুরুষদের মত মেয়েরাও না কি সব কাজ কর্‌তে পারে! এত দিন কর্‌তে পায় নি বলে পারে নি। হয় ত পারে। কিন্তু তা নিয়ে কোন্দল করে কি হ'বে? ...সে জন্যে আমার মোটেই লোভ হচ্চে না।

আমার যত লোভ এই মাটির ঘরটার জন্য। আমার স্বামীর মাটির ঘর। স্বামী আমার দেবতা নয়। অমানুষও ত নয়। তাই এত ভালবাসি। দেবতা হ'লে পার্‌তুম না, পশু হ'লেও হয় ত পার্‌তুম না। এই মাটির ঘরে আমার মানুষ স্বামীর সঙ্গে থাক্‌বার অধিকার,—এর বেশী আর কি চাই? এই অধিকার আমার অটুট্ থাকুক্।

১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪।

আজকাল বেশ একটু পড়া-শোনায় লাগা গেছে। অনেকগুলো বই এ ক'দিনে পড়্‌লুম। কাল ইব্‌সেনের 'ভূত' বলে বইখানা শেষ কর্‌লুম।

কি শক্তিশালী লেখক! বাংলায় পড়্‌চি, তর্জমার তর্জমা, তবু ফুটে বেরিয়েচে লোকটার কথা। সাহসী বটে। সব ভেঙ্গেচুরে খান্‌ খান্‌ করে।…এর বই আমায় কত যে ভাবিয়ে তোলে!

কি এই বংশগতি জিনিষটা? বড় ভয়ানক। ভীষণ এর আকর্ষণ। বাপের রোগ বা পাপ ছেলেকেও ধ্বংসের দিকে টেনে নেয়। এ কি সত্যি কথা? কেন এমন হয়? এক জনের কাজের ফল কেন অন্য জনকে ভোগ কর্‌তে হয়? হোক্‌ না সে বাপের ছেলে? বাপ কেন রোগ, পাপ-তাপ দিয়ে যা'বে? এ অবিচার নয়?

অনেক কথা মোহনকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে হ'বে। দেখি সে কি বলে।

২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪।

ইব্‌সেনের বইগুলো একে একে পড়্‌চি। ইব্‌সেন কাকে যে 'মায়ামৃগ' বলেচে বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। বইয়ের ঐ নাম। কিন্তু জিনিষটা কি?

আ, বাপ আর মেয়ের কি ছবিটাই দেখিয়েচে!…এ সব পড়ে একটি সন্তানের জন্য মনটা আরও যে উতলা হয়ে উঠে। মোহনের হয় না? … শেষকালে এম্‌নি করে গুলি খেয়ে ম'ল মেয়েটা!! … এটাতে একটু বিশ্রী ব্যাপার আছে … বংশগতির কথাও বাদ যায় নি।

'খেলাঘর!' খেলাঘরই বটে। তাই সে ঘর ভেঙ্গে গেল। বেচারা নোরা!…

ইব্‌সেনের দেখ্‌চি বংশগতির উপর ভয়ানক ঝোঁক। সব বইয়ে কিছু না কিছু আলোচনা আছে।

কেন জানি নে খেলাঘর পড়্‌তে পড়্‌তে আমার আজ আনন্দ হচ্চিল, দুঃখ নয়।

১৩ শ্রাবণ, ১৩২৪।

নাঃ, পড়্‌তে আর ভাল লাগে না। সময়ও কাটে না।

১৭ ভাদ্র, ১৩২৪।

হা ভগবান্! আমার সুখের ঘর কি এম্‌নি করে ভেঙ্গে দিলে? ওগো কেন দিলে? আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছিলুম যে এ শাস্তি দিলে? ...

নালিশ কর্‌বার মত আমার কথা নেই। কি নালিশ কর্‌ব? কার কাছে নালিশ কর্‌ব? হায়! কে জান্‌ত এ কথা? কে ভাব্‌তে পেরেছিল?...বাবা, এই জন্য তুমি পৃথিবীতে আমায় জন্ম দিয়েছিলে?... আজ এত কাল পরে আমার এ দশা হ'ল, যখন আমার মা হ'বার ইচ্ছা দিন দিন প্রবল হয়ে উঠ্‌চে?...মোহনকে আমি এ কথা কেমন করে জানা'ব?

১৮ ভাদ্র, ১৩২৪।

... কাল থেকে পৃথক্ বিছানায় শোবার বন্দোবস্ত হয়েচে। একটা রাতও সইতে পার্‌লুম না।

ছাদের কোণে অসহ্য দুঃখে কাঁদছিলুম। মোহন এল। তখনো সে জানে না এই সর্ব্বনাশের কথা। আমাকে আদর দিয়ে, স্পর্শ দিয়ে, আমার দুঃখ বাড়িয়ে তুল্‌ল। তাকে অনেক ব্যথা দিতে হ'ল।

কিন্তু আকাশ অন্ধকারে ছেয়ে যেতে আমার সাহস ফিরে এল। ভাব্‌লুম, কেন কাঁদব? আমি কি কাঁদবার মত কিছু করেচি?...

সে কান্নার এখন আর একটুও অবশিষ্ট নেই। একদিন এই ডায়েরীর পাতাতেই লিখেছিলুম, সতী বলে আমার মনে কোন দিন গর্ব্ব হয় না কেন? তখন জান্‌তুম না ঐ গর্ব্ব আমারও মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে, রক্তের মধ্যে মিশে আছে। আজ তা টের পেলুম।

যখন আমার দুঃখের কারণ জান্‌বার জন্য মিনতি কর্‌লে, ভাব্‌লুম সে আমার স্বামী। আমার উপর তার সম্পূর্ণ অধিকার। তাকে এ কথা জান্‌তেই হ'বে। রূঢ়ভাবে জানিয়ে দিলুম।

নারীর কাছে পুরুষ চিরকাল বীর হ'তে চায়। আমার স্বামীও চাইলে। বল্লে, স্বামীর অধিকারে তার জান্‌বার কৌতূহল নয়।

তবে কিসের অধিকারে ?...শুনে হাসি পেল, চোখের মধ্যে একটা জ্বালা অনুভব কর্‌লুম। স্বামীর অধিকারে নয়! শুধু স্বামী নয়, চির-কালের স্বামী যে। সেই জন্য আমরা ছেলেবেলায় ব্রত করি, বড় হয়ে মানত্‌ করি, তুমি তা জানো না কি গো ? তাকে স্পষ্ট করে বল্‌তে হ'ল।

তারপর সে এগিয়ে এল। বল্লে, "হাঁ, তুমি আমার চিরকালের স্ত্রী।" —গলা কেঁপে গেল, তবু বল্ল। তখন আমার সমস্ত হৃদয় দুঃখে ফেটে পড়্‌বার মত হ'ল। হৃদয়ে অসীম সুখও পেলুম।...

কিন্তু প্রিয়তম, তুমি সে কথা বোঝ নি, কিছু বোঝ নি। তুমি বোঝ নি, কেন তোমার পাশে দাঁড়িয়েও আর কথা বলি নি, চুপ করে ছিলুম।

চিরকালের স্ত্রী ? চিরকালের স্বামী ? ভালবাস্‌তে জান তুমি তবে ? অন্তত বল্‌তে পেরেচ ঐ কথা, আমার এমন সর্ব্বনেশে রোগের কথা জেনেও ? দেবতা আমার !

হায়, আমার মা হ'বার ইচ্ছা ! হায়, আমার রক্তমাংসে গড়া নারীর দেহ ! আমার সাধ আর এ জন্মে মিট্‌বে না। না না, আমায় ভুল বুঝো না, তোমার সন্তানদের মা তোমায় অভিশাপের পাত্র করে রেখে যেতে পার্‌বে না, প্রিয়তম। ... আমি দুঃখ পাই সেও ভালো।

আমার কথা

সতীশ, এই অবধি তোমার কাছে কথাগুলো বলা সহজ ছিল, কিন্তু এর পরের কথা তোমায় কেমন করে বুঝা'ব ? বল্‌বার মত কথা হয় ত

খুব বেশী নেই, কিন্তু ঘট্‌বার মত ঘটনা অনেক ঘটেছিল। সে সব অন্তর্লোকের ঘটনা।

তিন মাস কাট্‌ল। নিস্তার এক বিছানায় শোয়, আমি অন্য বিছানায়। সে আর আমার ভোগের সামগ্রী নয়। আর সবেতে তাকে পাই।

সে দিন সন্ধ্যায় তাকে বল্লুম, "নিস্তার, আজ!"

"আজ কি?"

"আমার সঙ্গে শোবে।"

ইঙ্গিতটা সে বুঝ্‌লে, তার কান লাল হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু মাথা দুলিয়ে বল্লে, "না।"

"কেন?"

"এরি মধ্যে ভুলে গেলে?"

"রোগের কথা ত। রোগ আর রোগ! আমাদের মধ্যে তাকে কি সর্ব্বদা দেখ্‌তে হ'বে?"

"হাঁ।"

"চিরকাল?

"হাঁ।"

"কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী।"

"সেই জন্যই ত তোমায় বাঁচাতে চাই।"

"স্ত্রী কি নও?"

"চিরকালের।"

"তবে?"

"কিন্তু ভোগের ত নয়।"

"হায়! তোমার মধ্যে সব প্রেম মরে গেল? এত যে প্রেম ছিল."

"তুমি বুঝ্‌বে না।"

"বুঝে আমার কাজ নেই। এত যে তোমার সাধ ছিল মা হ'বার, কোথা গেল? কত দিন ছেলের জন্য একান্ত কামনা করেচ, বলেচ কোলে একটা ছেলে পেতুম যদি—, সে সব কথা ভুলে গেলে?"

"সে কি ভুলবার?…কিন্তু এই কি তুমি চাও আমি জেনে শুনে আমার রোগের ধারা পৃথিবীতে অক্ষয় করে রেখে যা'ব?" তার চোখে জল।

"কে বল্লে রোগের ধারা অক্ষয় হ'বে? আমাদের ছেলেপেলেদের কিছু না ও হ'তে পারে ত। … ডাক্তার…"

"বুকে হাত রেখে তুমি ঐ আশ্বাস দিতে পারো? তুমি বিশ্বাস করো?"

না, বিশ্বাস করিনে।

আরো দু'বছর কেটে গেল। সতীশ, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিলুম আমার বুকের ভিতরে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা দিনে দিনে ঘনিয়ে উঠ্‌চে। সে আকাঙ্ক্ষা প্রথমে দেখা দিয়েছিল নারীকে ভোগ কর্‌বার রূপে। অনেক কষ্ট পেয়েচি সেটাকে নিয়ে। কত রাতে অসহায় নিস্তারকে আক্রমণ কর্‌তে গিয়েচি। নিষ্ঠুর নিস্তার সম্রাজ্ঞীর মত অটল মুখে আমায় ফিরিয়ে দিয়েচে, যেন আমার মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা দিয়েচে। অস্থানে যা'বার কথা পর্য্যন্ত ভেবেচি। নিজেকে বিনাশ কর্‌বার কল্পনাও মনে জেগেচে। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে এই আকাঙ্ক্ষার রূপ বদ্‌লে গেল।

কবে, কেমন করে, তা আমি নিজেও জান্‌তে পার্‌লুম না। একদিন দেখ্‌লুম, বুকের মধ্যে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েচে, বাপ হ'বার আকাঙ্ক্ষা। আমার ছেলের মুখ থেকে 'বাবা' ডাক্‌ শুন্‌বার আকাঙ্ক্ষা।

একদিন অন্ধকার আকাশের তলে নিস্তারের হাত ধরে বলেছিলুম, তুমি আমার চিরকালের স্ত্রী। সেটা নিতান্ত অহংকারের কথা। পুরুষের অহংকারে ও কথা বলেছিলুম। মনে ভাবনা ছিল, একটা জালে জড়িয়ে পড়্‌লুম বুঝি, মুক্তির আর পথ রইল না, উদ্ধার পা'ব না। নিজের উপর রাগ হয়েছিল, নিস্তারের উপর ঘৃণা হয়েছিল। স্ত্রীকে, স্ত্রীর এত বড় রোগকে আমি সহ্য কর্‌ব কি করে?

সে দিন গত হয়েচে। একদিন বুঝ্‌লুম কত ব্যর্থ ঐ রাগ আর ঘৃণা। জীবনের এক ক্ষণে সব বাঁধ, সব পাচীল ভেঙ্গে যেতে চায়। বুঝ্‌লুম নিস্তার আমার স্ত্রী, ইহকালের স্ত্রী,—এই কথাটাই বড়। ভোগের দিক্‌ থেকে তাকে চিরকাল হারিয়ে চিরকালের স্ত্রী রূপে পাওয়ার লোভটা বড় নয়। আমার প্রতিদিনের জীবনে তাকে ভোগের মধ্যেই পেতে চাই, ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনাও তখন ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে না। ভয়? ভয় আছে, কিন্তু আগ্রহও সেই জন্য। মাধুর্য্যও তাই।

আমার একটি ক্ষুধা শুধু মিটাবার উপায় রইল না। আর সব মিট্‌ল, আগের চেয়ে ভাল করেই মিট্‌ল। জীবনও আগের মত সহজ হয়ে গেল।...তবু মনে হ'তে লাগ্‌ল আমার সমস্ত জীবনটাই যেন মাটি হয়ে গেছে। প্রতি পদে নিজেকে অত্যন্ত রিক্ত অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লুম। একটি পশুবৃত্তির চরিতার্থতার অভাবে জীবনটাই যে এমন বিস্বাদ হয়ে যা'বে, এ কথা কে ভাব্‌তে পেরেছিল? কে জান্‌ত, এই একটি অভাব আর সব পাওয়াকে ছাপিয়ে মনের মধ্যে পরম হাহাকারের সৃষ্টি কর্‌বে?...

আমি নিজের এই দৈন্য আবিষ্কার করে যেমন লজ্জিত, তেম্‌নি বিস্মিত হলুম। কিন্তু এই ক্ষুধা মেটাবার কথা যে দিন তাকে প্রথম বল্লুম, সে দিন লজ্জিত ও আশ্চর্য্য হয়েছিলুম, আরামও পেয়েছিলুম, সে কথা অস্বীকার করি কি করে?

এর পরেও তাকে অনেক বার বিরক্ত করেচি। কিন্তু যখন বুঝ্‌লুম নতুন আর একটা ক্ষুধা জাগ্‌চে, তখন ভয় পেলুম। ভাব্‌লুম, আর নয়, দুটো শত্রুকে প্রশ্রয় দেওয়া হ'বে না। সে দিন হ'তে লড়াই আরম্ভ হ'ল।

লড়াই চল্‌ল। কিন্তু ক্ষুধা বেড়েই চল্ল। বল্লুম, "নিস্তার!"

"কি?"

"দেশ-ভ্রমণে চল।"

"চল।" সে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, যেন আমার হৃদয়খানা পড়্‌তে চায়।

আমি হাস্‌লুম। ভাবলুম, "এত্‌ কি সহজ?"

"কোথা যা'বে?"

"যেখানে মন যায়।...কোন জায়গা ঠিক নেই।"

"বেশ।"

জ্যোৎস্না রাতে তাজমহলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল, আমারি শুধু নয়, যুগে যুগে কত প্রেমিকের প্রিয়া হারিয়ে গেছে, চোখের সাম্‌নে থেকে সরে গেছে,—অনেকে হয় ত মোটে সুখের ঘরখানি বেঁধেছিল। তবু তারা বেঁচে ছিল, তাদের অনেকে মৃত প্রিয়ার জন্যই বেঁচে ছিল, আর কারু খোঁজ করে নি। এই ত অশ্রু মর্ম্মর এক প্রেমের সাক্ষী।...কিন্তু আমার? আমার প্রিয়া আমার চোখের সাম্‌নে রয়েচে। তবু কেন আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে? তবু কেন আমি দুঃখ পাই? শুধু একটা অতৃপ্ত

আকাঙ্ক্ষার জন্য ? হায় মানব মনের তৃষ্ণা ! কে তোমায় রোধে ? কেমন করে রুধ্‌বে ?

ঘুরতে ঘুরতে ঘোরার নেশা কেটে গেল। নতুন জায়গার মোহ দু'দিন থাকে, তারপর আর থাকে না। তখন একদিন বল্লুম, "এবার বাড়ী।"

নিস্তার হাস্‌লে, কিছু বল্লে না। কিন্তু ও হাসে কেন ?

বাড়ী এসে স্থির হয়ে না বসেই বল্লুম, "লিখ্‌ব।"

"কি লিখ্‌বে ?"

"এমন কিছু যাতে আমাদের নাম অমর হ'বে।"

"আমাদের ?"

"হাঁ; তুমি আর আমি দু'জনে মিলে আমাদের সাহিত্য গড়ে তুল্‌ব।"

"আমি জানি নে কিছু।"

"আমিও ত জানি নে, কিন্তু চেষ্টা কর্‌তে দোষ কি ?"

"সব চেষ্টা সফল হয় না গো।"

আমি রাগ কর্‌লুম। "হাঁ, তোমার স্বামীর প্রতিভার'পরে তোমার এম্‌নিতর বিশ্বাস বটে।"

"কিন্তু অমরত্বের লোভ আমার নেই ত।"

"তোমার না থাকে আমার আছে। আমার জন্য কর্‌বে না ?"

লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লুম। যত না লিখ্‌লুম তার চেয়ে ঢের বেশী কাগজ নষ্ট কর্‌লুম। অনেক লেখা মাঝখানেই শেষ কর্‌লুম। যেগুলো শেষ কর্‌লুম, সেগুলোও ভাল হয় নি বলে ছিঁড়ে ফেল্লুম। তারপর আর লিখ্‌তে ভাল লাগে না, লেখার কথাও খুঁজে পাই নে। মনে হয়, আমার মাথাটায় অনেক ভাব ঠাসা হয়ে আছে। অথচ

লিখ্‌তে গিয়ে থই পাই নে। কেন এমন হয়? কেন আমার মন খুল্‌তে পারি নে? হৃদয় আমার কোথায় হারিয়ে ফেলেচি!

পড়্‌তে গিয়েও ঐ দশা হ'ল। অনেক কষ্টে দু'পাতা পড়ি, তারপর বইগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে। তখন মনে হয়, এই সব ছাই-পাঁশ পড়ে কি করে মন এত দিন খুসীতে ভরে উঠ্‌ত?

এম্‌নি ভাবে যাতে হাত দি, তাই ভাল লাগে না। তখন ভাব্‌লুম, না, এ ছলনার কিছু প্রয়োজন নেই। আমি শুধু শুধু দিন কাটা'ব। ছেলের বাপ হয়েচি,—এই কল্পনা করে স্বপ্নের জাল বুন্‌ব। জীবন আবার সহজ হয়ে যা'বে।

নিস্তারের দেহের প্রতি লোভ কমে এসেচে। আমার তৃষাতুর হৃদয় চায় একটি কচি ছেলের গলার 'বাপ' ডাক। তাকে ধর্‌তে, ছুঁতে, আদরে ভরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু নিস্তার তার আর উপায় রাখ্‌লে কৈ?

সে দিন নিস্তার তার ভিজে কাপড়ে আমার সাম্‌নে দিয়ে দৌড়ে ঘরে গেল। দেখ্‌লুম তার সমস্ত শরীরে যেন যৌবনের বান ডেকেচে, বুকের মুখের রক্ত যেন টগবগ্ করে ফুট্‌চে, ভিজে কাপড় ঠেলে তার প্রতি অঙ্গ নিজের বর্ণচ্ছটা প্রকাশ কর্‌চে। আমি অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলুম। নিস্তারকে ত কত বার দেখেচি, পড়া পুঁথির মত তাকে শেষ করে দিয়েচি। তার দেহ, অত্যন্ত পরিচিত আমার। তবু আজ ভোরের আলোয় এ কোন্ সর্ব্বনেশে রূপ নিয়ে দেখা দিল নিস্তার আমার? এই কি আমার চির-পরিচিত নিস্তার? একে ত চিনি নে। একে চেনা আমার ত শেষ হয় নি। আমার চির-পরিচিত নিস্তার আর এ নিস্তার

ত এক নয়। সে চির-পরিচিতা কৈ? এই অপরিচিতার জন্য আমার সমস্ত মন যে পাগল হয়ে উঠ্‌চে। একে না পাওয়ার ব্যথা যে আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পারব না। আমার নিস্তার, অথচ আমিই তাকে পা'ব না? তার এ যৌবন আমারই ভোগে লাগ্‌বে না? না লাগ্‌বে যদি, কেন তবে তার যৌবনে জোয়ার এল? কেন সে তবে আমার স্ত্রী? না, না, তাকে চাই। তাকে ক্ষমা কর্‌ব না। তার রোগ তাকে আর আমার কাছ থেকে দূরে রাখ্‌তে পারবে না।...

হায়, আমার বাপ হওয়ার কল্পিত সাধনা! কি মিথ্যা ছলনা এ অন্তরের গভীরতম বাসনা লুকিয়ে রাখ্‌বার! ... আমি বাপ হ'তে চাই, সে কথাটা সত্য, না, আমি স্বামীর সব দাবী-দাওয়া মিটিয়ে পেতে চাই, সেই কথাটা সত্য? বিশ্বাস কর সতীশ, আমি নিজেকে বুঝে উঠ্‌তে পারি নে। আমার বার বার মনে হ'তে লাগ্‌ল আমার ভিতরকার স্বামী এত দিন বাপের মনোহর মূর্ত্তি ধরে আমায় ভুলিয়েচে।... তখন ভাব্‌লুম, তা যদি হয়, তবে নিস্তারের সঙ্গে কি প্রতারণা কর্‌ব? আমার চিরকালের স্ত্রীর সঙ্গে? কেন কর্‌ব? তাকে যদি না পাই, তবে আর কাউকে চাই। আমার ভোগের জন্য চাই।...

এতখানি বুঝিয়ে বলা সহজ নয়। তা ছাড়া কি বল্‌ব তাকে? বল্‌ব কি, অন্য একটি নারী এনে দাও, তাকে দিয়ে আমার তৃষ্ণা মিটাই? বল্‌ব কি, তোমাকে দেখে পিপাসায় মর্‌চি, তুমি দেবে না, যে দেবে তাকে এনে দাও? হাঁ, তাই বল্‌তে হ'বে। এই কঠিন কথা বল্‌তে হ'বে?

কেমন করে বলি? বল্‌বার জন্য অনেক বার তার কাছে গেলুম, তার মুখের দিকে তাকালুম,—কথা কইলুম, শুধু সেই কথটি বলা হ'ল না। স্ত্রী ত! অত্যন্ত বেদনা পা'বে যে। এ বেদনা কি করে দি?

অথচ এ বেদনা পাওয়ার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার সাধ্য আমার নেই।

অবশেষে এক বিকেলে। নিস্তার তার খাটের উপর বসে আছে, আমি তার কাছে গিয়েছি, তার দিকে তাকাতেই সে বল্লে, "কিছু বল্‌বে?"

"হাঁ···না···এমন কিছু নয়।"

এমন কিছু নয়? হায়, কি মিথ্যা কথা! হায় মিথ্যাবাদী! ভাব্‌লুম পালিয়ে যাই।

"বল্‌তে আপত্তি আছে, এমনতর কথা?"

"নিস্তার!"

"রাগ কোর না।···আমি তোমার স্ত্রী। তাই বলে তোমার অন্তরের সব কথা সব আকাঙ্ক্ষা জান্‌তে পার্‌ব, এমন মনে কোর না।"

"আমি বিয়ে কর্‌তে চাই নিস্তার, অনুমতি দাও।"

"তুমি?"···তার স্বর একটুও কাঁপল না, মুখের একটি রেখাও বদ্‌লাল না। প্রশ্ন কর্‌লে, কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে কোন সুর ছিল না।

সে নিজের চিন্তায় ডুবে গেল। আমার সাহস বাড়্‌ল। ভাব্‌লুম, সব চেয়ে কঠিন কথাটাই ত বলে ফেলেছি, বাকীটা বল্‌তে ভয় কেন? বল্লুম, "আমায় ক্ষমা কর নিস্তার। আমার এ রক্তমাংসের দেহ···আর সহ্য হয় না।" দু'বৎসর পর!

"কি চায় সে?"

হঠাৎ অত্যন্ত হাসি পেল। এ প্রশ্ন কর্‌তে পারে নিস্তার? হয় ত নিস্তারই পারে!

"কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা? সে রাত্রির প্রতিজ্ঞা?"

"চিরকালের স্ত্রী?"

"না, চিরকালের স্বামী"—তার স্বরে যেন ঠাট্টার আভাস পেলুম।

"জলে ভাসিয়ে দেব।"

"তা বুঝ্‌চি! কিন্তু মনে আছে প্রতিজ্ঞা?"

"আছে।"

"তবু বল্‌চ? বল্‌তে বাঁধ্‌চে না?

আমার ক্রোধ হ'ল। "নিস্তার, এমন করে আর আমায় কত বেঁধে মারবে?"

"বেঁধে মারচি?"

"নয় ত কি? প্রতিজ্ঞা আমি পাল্‌তে চাই। কিন্তু এমন করে নয়।"

"কেমন করে?"

"আমার সর্ত্তে?

"কি তোমার সর্ত্ত?"

"তোমায় আমার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হ'বে।"

"কেন?"

"তুমি আমার চিরকালের স্ত্রী, এ অঙ্গীকার আমি করেচি। কিন্তু এমন অঙ্গীকার ত করি নি যে, তোমায় ছোঁ'ব না, তোমায় পা'ব না।"

"না, কর নি।"

"তাই হয় তোমায় চাই, নয় অন্য এক নারী চাই।"

নিস্তার হাস্‌লে। "পুরুষ তোমরা। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে ভোগ করে আস্‌চ। সে রক্তের ধারা কি আজ বদ্‌লে যা'বে? তাকে শাসন করে রাখ্‌ব, সাধ্য কি? … জান্‌তুম এমন দিন আস্‌বে। তোমাকে আলাদা শুইয়েচি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করাই নি, তুমি আমায় ছুঁতে পা'বে না।"

মন আনন্দে অধীর হ'ল। "তবে তুমি রাজী আছ?"

"না গো না।"

হায়!

"তবে অন্য নারী আন্‌তে দাও।"

"কি? কি কর্‌বে তুমি? আমার এই ঘরে তুমি অন্য নারী নিয়ে আস্‌বে?..." আর এক অন্ধকার রাতের মত তার দুই চোখ জ্বলে উঠ্‌ল।

"না, অম্‌নি আন্‌ব না। বিয়ে কর্‌ব।"

"কিন্তু তোমার চিরকালের স্ত্রী! কি হ'বে তার?"

"সে থাক্‌বে। সে চিরকালের স্ত্রী হয়ে থাক্‌বে। কিন্তু আমার ইহকালের জন্য একটি স্ত্রী দরকার হয়েচে।"

"মিছে কথা!...আমি বেঁচে থাক্‌তে সে তোমার ইহকালের স্ত্রী হ'তে পারে না।"

"পারে না?"

"না।...ইহকালের স্ত্রী শুধু একজনই হ'তে পারে।"

"ওটা তোমার তত্ত্ব-কথা।"

"হোক্ তত্ত্ব, তবু সত্য।"

সতীশ, সে দিন যখন ঘরে ফিরে এলুম মনের মধ্যে ভারি একটা সান্ত্বনা পেলুম। দেখ্‌লুম মনটা হাল্কা হয়ে গেছে। আনন্দও হ'ল। কেন এ আনন্দ? মানুষের মধ্যে পশুর জয়ে এত আনন্দ কেন? এ আনন্দ কি উচিত?

সংসার আগের মত চল্‌ল। কিন্তু দেখ্‌লুম, নিস্তারের চোখের কোলে কালি পড়েচে। হাসি দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখ্‌তে পারে না। আর রাত দিন কি ভাবে। রমণীর মন! তার স্বভাবের হাত সে এড়াবে কি করে?

সাত আট দিন গেল। তারপর এক দিন সকালে হঠাৎ বল্লে, "আমি ভেবে দেখেচি।"

"কি ?"

"তোমার কথা।..."

আমি তার দিকে তাকালুম। পরিষ্কার, শান্ত দুই চোখ। "আমি তোমায় মুক্তি দিলুম।" স্বরের মধ্যে অভিমান নেই, জ্বালা নেই, দুঃখ নেই,—অকম্পিত।

আমি হাঁপিয়ে উঠ্‌লুম, "মুক্তি" ? কে চায় এমন মুক্তি ? এ মুক্তিতে আমার মন একটুও প্রসন্ন ত হ'ল না। কে কাকে মুক্তি দিচ্চে, দিতে পারে ?

"হাঁ, আমি তোমায় মুক্তি দিলুম।"

"কিসের থেকে ?

"আমাকে চিরকালের স্ত্রী বলে স্বীকার করার দায় থেকে।"

"ও কি বল্‌চ, নিস্তার ? এমন করে মুক্তির লেন-দেন চলে কি ?"

"চলে।"

"আর চিরকালের স্বামী হওয়া থেকে মুক্তি যদি..."

"থামো। অকারণ মহত্ত্ব দেখাতে যেও না। দরকার তোমার, গরজ তোমার। কিন্তু কেন ছলনা কর্‌লে ?"

"ছলনা !"

"ছলনাই ত।"

"আমি !"

সে হাস্‌লে। "তুমিই ত। কিন্তু সে কথা হয় ত তুমিও জানো না। যদি আমি না জান্‌তুম, রাজী হতুম না। নারীর জন্য তৃষ্ণার পিছনে রয়েচে তোমার লোভাতুর পিতার মন, যেমন এক সময়ে আমার ছিল মার মন। এই লোভাতুরতা পরে এল। যদি আগে আস্‌ত..."

"নিস্তার! নিস্তার!..."

নিস্তার চোখের জল মুছ্‌লে। "সে কথা তুমি বিশ্বাস কর নি হয় ত। কিন্তু এ ভালোই হয়েচে। কতকগুলো রুগ্ন জন্মলাভ করে নি।"

"তুমি বুঝ্‌চ না ...।"

"আর ত বোঝাবুঝির কিছু নেই।"

"আমায় ছেড়ে যা'বে?"

"যেতেই হ'বে যে।"

সতীশ, আমার বলার কথা ফুরিয়েচে। যা বল্‌তে চেয়েছিলুম, নিজের অক্ষমতার জন্য স্পষ্ট কর্‌তে পার্‌লুম না। তবু তুমি বুঝ্‌বে। অন্তত আশা কর্‌চি, বুঝ্‌বে। এখন তুমি বল অসত্য বা অসুন্দর আমি কি করেচি। অন্যায় হয় ত করেচি। ঠিক জানি নে। কিন্তু সে জন্য আমায় নরকের ভয় দেখানো বৃথা। নরকের কথা শুন্‌লে আমার হাসিই পায়। ইতি,

তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী নই

মোহনলাল।

আশ্বিন, ১৩২৮।

পরিচয়

উৎসর্গ

আমার বড় সাধের নাতি

শ্রীমান্ প্যারীশঙ্কর রায়ের করকমলে।

বৎস! আমার যে উইলে তোমাকে সমস্ত দিয়া গিয়াছি, তাহার মধ্যে এই ছোট ডায়েরীখানার কথাও রহিয়াছে। তুচ্ছ জিনিষ বলিয়া হাসিয়ো না, ভাই! এত বুড়া হইয়া গেলাম, কত দেখিলাম, কত ঠেকিলাম, কত শিখিলাম, কিন্তু আজ এই পর-পারের তীরে দাঁড়াইয়া মনে হইতেছে, তুচ্ছ কিছুই নহে। মনে হইতেছে, এ জীবনের মেয়াদটা যদি আবার ফিরিয়া পাইতাম তবে বড় মধুর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিতাম। ভুল হইত বটে, ভুলের হাত আমি এড়াইতে চাহি না। কিন্তু,—পড়িলেই বুঝিবে।

আশীর্ব্বাদ করি মানুষ হও। ইতি,

তোমার দাদা মহাশয়।

বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি, আর বেশী দিন বাঁচিব না। যাহা বলিবার আছে, এই বেলা বলিয়া রাখা ভাল। নহিলে কোন দিন হয় ত আর বলা হইবে না।

সারাটা জীবন দেশের কাজে খাটিলাম। অকলঙ্ক চরিত্র-মহিমা আমার আছে। মান বল, যশ বল, অর্থ বল, কিছুরই আজ অভাব নাই। এত পাইয়াছি যে মনে হইতেছে মরিবার আগে কাহাকেও কিছু ভাগ দিয়া গেলে ভাল হইত। বাহিরের লোকে এ অবস্থায় যদি ভাবে আমার মত সুখী কেহ নাই, তবে তাহাকে বিশেষ দোষ দিতে পারি না। কিন্তু আমি জানি, আমার অন্তরের সুখ এবং শান্তি অনেক দিন পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই।

কেন, সেই কথাটা আজ বলিব। আমার জীবনের এই কাহিনীর শেষ পর্য্যন্ত যে শুনিবে, আমি নিশ্চয় জানি তাহার আর আমার প্রতি আগেকার মত শ্রদ্ধা থাকিবে না,—এই কথাটাই তাহার বার বার করিয়া মনে হইবে যে, এ লোকটা এত দিন ফাঁকি দিয়া আমাদের ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ইহার চেয়ে চরিত্র হিসাবে আমরা কোন অংশে খাটো নহি।

সত্য বলিতেছি, ফাঁকি দিবার আমার মৎলব ছিল না। আমি কবুল করিতেছি, জীবনের একটা দিক্ আমি চিরকাল লোকচক্ষুর অগোচর রাখিয়াছি। কিন্তু সে জন্য আমি বিধাতার কাছেও মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে প্রস্তুত নহি। পরলোকে যদি শাস্তি কিছু পাইতে হয়, মাথা পাতিয়া লইবার সাহস ও শক্তি যেন থাকে, ইহাই প্রার্থনা।

জীবনের যে নিভৃত কথাগুলি আজ বলিতে যাইতেছি, কেন এত দিন সে সব কাহারো কাছে বলি নাই, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বোধ করি, লজ্জা আসিয়া বাধা দিয়াছে। হয় ত তাহাই সব নয়। এ সংসারের

হাঁটে অনেক পথ চলিলাম, ঠেকিয়া ঠেকিয়া পথের মাঝে কত দুঃখ পাইয়াছি, কত কান্না কাঁদিয়াছি, কেহ অশ্রুজল মুছায় নাই। বোধ করি, এই কথাটা যদি জানিতে ও বিশ্বাস করিতে পারিতাম যে ভুলত্রুটিই মানুষের জীবনের সবখানি নয়, কিন্তু পাপ ও অপরাধকে লইয়া এবং ছাড়াইয়াই মানুষের জীবন মহত্তম এবং বৃহত্তম কিছু, এবং এই মানুষকে কেহ ভুল করিবে না, বরঞ্চ উদার আলিঙ্গনে ঘরে তুলিয়া লইবে, তাহা হইলে আমার শ্রান্ত মন সেই মুহূর্ত্তে নিজেকে খোলসা করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। কিন্তু বুঝিয়াছি, সংসার বড় বিষম ঠাঁই, এখানে সহজে ক্ষমা মিলে না, আমি যদি বা ক্ষমা পাই, আমারি জন্য অনেক খানি সহিয়া যে রমণী নিঃশব্দে কবে অজানা লোকে প্রয়াণ করিল, তাহার স্মৃতিকে ইহারা অপমান করিবে। সে আমি সহ্য করিতে পারিতাম না।

কলিকাতা শহরে আসার পর তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। তখন পড়িতেছিলাম। ইহার আগে কলিকাতার অনেক বদ্‌নাম শুনিতে পাইতাম,—সেখানে নাকি সহজেই ছেলেরা বিগ্‌ড়াইয়া যায়। কিন্তু এ তিন বৎসরেও তাহার কোন পরিচয় দিলাম না। আর দিবই বা কিরূপে? স্কুল-কলেজ, বই-কেতাব, কলেজের খেলা এবং মা,—ইহার বাহিরে আমার কোন দরকার বা আকর্ষণ ছিল না।

কিন্তু সেই বার বহু দিনের পুরাণা ঝী মারা যাওয়ায় ভারি কষ্টে পড়িতে হইল। অনেক ঘোরাঘুরি, অনেক হাঁটাহাঁটি করিবার পরও কোন ঝী কিংবা চাকর মিলিল না। বড় মুস্কিলে পড়িলাম।

সে দিন কলেজ ছুটি। আমি এবং আমার এক বন্ধু লোকের খোঁজে

বাহির হইয়া পড়িলাম। কলিকাতা শহরে এমন ধারা লোক খুঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন, তাহা এই কথা বলিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে, একবার একটি ছোকরাকে সে বাসার কাজ করিতে জানে কি না জিজ্ঞাসা করায় যথেষ্ট গালাগালি খাইয়াছিলাম। ভদ্রলোকের ছেলেকে আমি এমন করিয়া অপমান করি, তাহার সাত পুরুষে কেহ চাকরী করিয়া খায় নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাস্তাটার নাম স্মরণ হইতেছে না, যা হোক্ কলিকাতা শহরের একটা রাস্তা। ঠিক মোড় ফিরিবার পথে ফুটপাথের উপর দেখিলাম একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া। বয়স তাহার কত হইবে, আন্দাজ করিতে পারি না, কিন্তু দেখিতে অত্যন্ত কচি। এমন একটা মাধুর্য্য ও কোমলতা তাহার সর্ব্বাঙ্গে মাখানো ছিল যে, ঐ শুষ্কমুখ ও ছিন্নবসনও তাহা ঢাকিতে পারে নাই। সুন্দর কিছু দেখিলেই মনকে আকর্ষণ করিবে, এ অস্বাভাবিক নহে। আমি ও আমার বন্ধু তাহার মুখের উপর হইতে চোখ ফিরাইতে পারিলাম না। সে আমাদের দিকে করুণ নয়নে চাহিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিল না।

আমি বলিলাম, বোধ হয় ভিক্ষা চায়।

বন্ধু কহিল, ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়া মনে হইতেছে। হয় ত কষ্টে পড়িয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু লজ্জাবশতঃ কাহারো কাছে কিছু চাহে না। চল কিছু গিয়া দিয়া আসি।

চারি আনা পয়সা তাহার হাতে দিতে গেলাম। সে হাসিয়া উঠিল, আমার দিকে আশ্চর্য্য দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, বাবু পয়সার আমার কিছুমাত্র দরকার নাই।

ভাবিয়াছিলাম, গরীবের মেয়ে, পয়সা দিলেই আগ্রহ করিয়া লইতে চাহিবে এবং তাহা হইলেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিব ঝীর কাজ

সে করিতে পারিবে কি না। কিন্তু তাহা হইল না! তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সে দান গ্রহণ করিল না, তবু সে না গ্রহণ করাটাও, কেমন করিয়া জানি না, মিষ্টতায় ভরিয়া দিল। যখন বাটী ফিরিয়া আসিলাম, মনে আর কোন ক্ষোভ রহিল না।

সে দিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া অনেক ক্ষণ ঘুম হইল না। সেই রাস্তার ধারের আশ্চর্য্য মেয়েটির ছবি বার বার আমার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতে লাগিল। তাহার মুখ, তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার চোখের আশ্চর্য্য দৃষ্টি, তাহার হাসি এবং দান-প্রত্যাখ্যান কিছুই আর অপরিচিত রহিল না, প্রত্যেকটি অন্তরের স্তরে স্তরে জমা হইয়া সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। হৃদয়ের মধ্যে কি এক পুলক-বেদনা জাগিয়া উঠিল, যাহাকে না পারিলাম বুঝিতে, না পারিলাম দূর করিতে!

পর দিন ভোর হইতেই গত রাত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল, সমস্ত মনটা ব্যথায় টন্ টন্ করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, পথ চলিতে চলিতে কোন্ আমার প্রিয়তমাকে পাইয়াছিলাম, কিন্তু হারাইয়া ফেলিয়াছি।

কিন্তু কালকের রাস্তার মোড়ে আসিয়া যেই দেখিলাম, মেয়েটি আজও সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি মনের সমস্ত অভিমান ও অহংকার এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। আশ্চর্য্য, আমাকে দেখিয়া মেয়েটিরও মুখ নিবিড় হাসিতে ভরিয়া গেল। সে ভারি স্নিগ্ধ হাসি, যেন বলিতে চাহিল, আসিয়াছ? বেশ করিয়াছ। আমি কিন্তু একবার তাহাকে দেখিয়াই দ্রুতপদে পথ ধরিয়া চলিয়া গেলাম। একটি কথাও কহিলাম না।

আমাকে কি নেশায় পাইল কে জানে! প্রতিদিন সকাল বেলা

তাহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসি, দেখি তেমনি সে হাসি মুখে দাঁড়াইয়া আছে। একটি কথাও কোন দিন হইল না, অথচ আমি ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেছিলাম, তাহার অতি কাছাকাছি যেন আসিয়া পড়িয়াছি। ঐ একটু খানি তাহার হাসির ভিতর দিয়া সমস্তটা মানুষ যেন ক্ষণেকের মধ্যে বিদ্যুতের মত চমকিয়া উঠে! সে যে আমার জন্য প্রতিদিন ওখানে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহাই আমার হৃদয় যেন বুঝিতে চাহিল।

কয়েক দিন পরের কথা। আমি সেই রাস্তার মোড় ঘুরিয়াছি। যেমন তাহাকে ছাড়াইয়া যাইব, শুনিতে পাইলাম মেয়েটি পিছন হইতে ডাকিতেছে, বাবু শোন, কথা আছে। আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। সেই মেয়েটি আমার কাছে আসিয়া আবার কহিল, কথা আছে বাবু, শোন।

তখন আমার মনে কি ভাবের যে উদয় হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু অবাক্ হইয়া তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া একটু হাসিয়া সে বলিয়াছিল, অমন করে কি দেখ্‌চ, বাবু?

আমি ফস্ করিয়া কহিলাম, তোমাকে।

মুহূর্ত্তে সমস্ত মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। বলিল, রাস্তার লোকের দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকে কেউ, না?

আমি কহিলাম, জানি না, কিন্তু তোমার দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে।

সে বলিল, ঠাট্টা রাখো। আমি আজ ক'দিন ধরে চাকরী খুঁজ্‌চি, পেলে কোন বাড়ীতে ঝীর কাজ করি। বল্‌তে পারো কারো বাড়ী চাক্‌রী পাওয়া যায়?

আমি আনন্দে বলিয়া উঠিলাম, ভাবনা নাই তোমার। এস, আমার সঙ্গে এস। আমি তোমায় কাজ দিব।

সে হাসিয়া উঠিল। বলিল, আমার জন্য কি নূতন একটা চাক্‌রী তৈরী কর্‌বে যে চাক্‌রী জুটিয়ে দিবে বল্‌চ ?

আমি কহিলাম, না গো না, এত দিন আমি একটা ঝী-ই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। রোজ রোজ তারই জন্য এ দিক্ দিয়ে হেঁটে যেতাম দেখ নি ?

বটে ? তারই জন্য ?...তা হ'বে।—বলিয়া অকারণে হাসিয়া কহিল, আমার নাম লীলা।

সেই দিন হইতে আমাদের বাড়ীতে লীলার কাজ জুটিল। আমারও আর সেই পুরাণা রাস্তার মোড় ঘুরিবার কিছুমাত্র উৎসাহ রহিল না।

জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন দিন লীলার কোন পরিচয় জানিতে পারি নাই। হইলে কি হয় ? ভালবাসার ত জাতি-বিচার নাই। আমার সমস্ত প্রাণ কি ভালো বাসিতেই তাহাকে চাহিত, তাহা আমি কি করিয়া বুঝাইয়া বলিব ?

মনে করিও না, ছোট লোকের মেয়ে বলিয়া ভালবাসা বুঝিবার কিংবা ভালবাসিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। আজ যতই তাহাকে মনে করিতেছি, ততই চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে এবং এই কথাটাই মনে হইতেছে যে, অত বড় মন ও প্রেমের পরিচয় দিয়া যে গেল কিছুতেই তাহাকে কেবল দাসী বলিয়া আর ভাবিতে পারি না। নিশ্চয় তাহার বড় পরিচয় কিছু ছিল, যাহা আমি জানিতাম না, কিন্তু তাহার অন্তর্য্যামী জানিতেন।

এ কথা ত আমার অনুভব করিতে দেরী হয় নাই যে, সে নিভৃতে তাহার হৃদয়ের একান্ত ভালবাসা ও পূজা আমাকেই নিবেদন করিয়া দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সংক্ষেপে বলিব। তরুণ মন, তখন সংসারের বাঁধাবাঁধি ও শাসনকে আজিকার মত ভয় ও শ্রদ্ধার সহিত দেখিতে শিখি নাই। আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম, এই মেয়েটিকে বিবাহ করিব। কারণ, এমন করিয়া এত সহজে আর কাহার হৃদয়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে পারিব? এবং কেই বা আমাকে এত প্রাণঢালা ভালবাসা দিতে পারিবে? তখন অন্তরের মধ্যে স্বাধীনতা ও সরলতার যে প্রাচুর্য্য ছিল, তাহারি জন্য ইহা কিছুই কঠিন বলিয়া বোধ হইল না।

সুতরাং মাকে বলিলাম,—মা, লীলাকে আমি বিবাহ করিব।

মা অত্যন্ত রাগ করিলেন, অনুনয়-বিনয় করিলেন এবং অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে বাবাকে চিঠি লিখিতে বসিলেন।

বাবা লিখিলেন, সত্য, ফের যদি আমাকে এমন কথা শুনিতে হয়, তবে আর তোমার মুখ দেখিব না। সেই হতভাগীকে আজই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে।

সে বড় গভীর বিষাদে রাত্রি কাটিয়াছে। বেশ মনে আছে, সে দিন নিরুপায় কান্নায় কান্নায় বালিশ বিছানা ভিজিয়া গিয়াছিল। এই বাধা পাইয়া আমার সমস্ত যৌবন সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে আমাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। লীলাকে পাইবার জন্য মন আরো বেশী করিয়া উদ্বেলিত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিধাতার দ্বারে নালিশ পাঠাইতে লাগিল।

আমি মনে মনে কহিলাম, লীলা, তোমাকে আমি বিবাহ করিবই। সংসারের বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে। আমাদের দু'জনের প্রেমের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইতে চায়, কিন্তু তাহাকে আমি ভয় করি না। আমি জানি, ইহার পর উভয়ের প্রেমে উভয়ে পূর্ণ থাকিয়া সারা জীবন কাটাইয়া দিতে পারিব।

আমি কহিলাম, লীলা, তোমায় আমি বিবাহ করিব। লীলা আমার দিকে আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া আছে দেখিয়া আবার কহিলাম, লীলা, তোমায় আমি বিবাহ করিতে চাই।

লীলা হাত জোড় করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, এমন কথা তুমি বলিও না। ওগো, অমন করিয়া তুমি নিজেকে অপমান করিও না। আমি সহ্য করিতে পারিব না।

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, লীলা, সত্য বলিতেছি, তোমাকে নহিলে আমার চলিবে না। তোমাকে আমি বিবাহ করিব।

লীলা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, তোমার অতখানি প্রেমের আমি কি যোগ্য ? আমি যে যোগ্য নহি। আমাকে এত ভালবাসিও না।

আমি কহিলাম, এস আমরা পলাইয়া যাই।

কিন্তু না, লীলা কিছুতেই সেই কথা শুনিল না। আমাকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিত বলিয়াই সে অমন প্রাণপণ করিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া আমাকে রক্ষা করিতে চাহিল। তাহার অন্তর সে ত আমায় দান করিয়াছিল, কিন্তু ঐ দেহটা কিছুতেই দিতে চাহিল না। বলিল, উহা পবিত্র নয়। উহা তোমাকে দিতে পারিব না।

লীলাকে কোনো মতে বিবাহ করিতে পারিলাম না। শুধু তাই নয়। ইহার পর আমি একদিন একা ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় লীলা আসিয়া হাত জোড় করিয়া কহিল, আমার একটা কথা রাখিবে ?

আমি কহিলাম, বল।

সে অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।

সে যে কত কষ্টে এই কথা বলিল, এবং হাসি দিয়া নিজেকে ও আমাকে ছলনা করিতে চাহিল, তাহা আমার অন্তর্য্যামী মন সহজেই

ধরিতে পারিল। এবং সেই জন্য বক্ষের পুঞ্জীভূত বেদনা অশ্রু হইয়া চোখ দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। রুদ্ধকণ্ঠে তাহার হাতখানি ধরিয়া কহিলাম, লীলা, তুমি! তুমি এই কথা বলিও না। তুমি এতখানি নিষ্ঠুর হইও না।

মুহূর্ত্তের জন্য বোধ করি সে ধৈর্য্য হারাইল। অশ্রু-সজল চোখে আমাকে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

আমি বলিলাম, লীলা, এমনি করিয়া যদি অনন্ত কাল কাটিয়া যায় তাহা হইলে বিধাতার কাছে আমার আর নালিশ করিবার কিছু থাকে না।

সে হাসিল,—নির্ম্মল, সুন্দর হাসি। তারপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আমার দুই হাঁটুর উপর দুই বাহু রাখিয়া বলিল, আমার আজিকার এ স্পর্দ্ধা ক্ষমা করিও।···আমা অপেক্ষা কে বেশী জানে যে, আমাকে বিবাহ করিলে তোমার ভালবাসার অপমান হইবে? সে হইতে পারে না। তুমি এমন করিয়া ভাসিয়া যাইতে পারিবে না। আমার ভালবাসাকে তুমি যদি একটুও শ্রদ্ধা কর, তবে তুমি নিশ্চয় বিবাহ করিয়া আমাকে রক্ষা করিবে।

আমি অধীর হইয়া কহিলাম, আমি বিবাহ করিলে তোমাকে কি করিয়া রক্ষা করা হইল?

সে হাসিয়া বলিল, বুঝিতে পারিতেছ না! আমার জন্মের ইতিহাস ত শুভ্র নয়, অকলঙ্ক নয়। পঙ্কে জন্মিয়াছি। সুতরাং এই দেহ তোমাকে দান করিয়া তোমার আত্মাকে কলুষিত করিব না। আর তুমি যদি বিবাহ কর, তবেই আমি এখানে থাকিতে পারি। কারণ, আমিও ত রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। নিজেকে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। একমাত্র তুমি বিবাহ করিলে আমার এখানে থাকা সম্ভব হয়।

সেই দিন আমি এ সকল কথা নিঃসংশয়ে মানিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু পরে বুঝিয়াছি সে ছলনা দ্বারা আমাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। সে যে আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে, আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না, তাহারই জন্য কাছে কাছে থাকিতে চাহিয়াছিল। তাহার রক্ত মাংসে গড়া দেহে সহ্য করিবার কত শক্তি ছিল, তার আমি বহু প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু দাসী ভাবে ছাড়া অন্য ভাবে তাহার আমার গৃহে থাকা অন্য কেহ সহ্য করিতে পারিত না।

আর বেশী কিছু বলিবার নাই। আমি বিবাহ করিলাম। চারি বছর পরে আমারি ঘরে আমার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে লীলা প্রাণত্যাগ করিল। ইহারি পরে আমি দেশের কাজে মাতিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, সুখ যদি কোথাও থাকে ত এইখানে। এবং বিরাট কর্ম্মস্তূপের মধ্যে সেই সন্ধ্যার বিদায়-কালীন মুখখানিকে ভুলিয়া গেলাম।

আজ আমি বুড়া হইয়াছি, অনেক যশ উপার্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু জীবনের এই সন্ধ্যাবেলায় দেখিতেছি, জীবনের সেই প্রথম প্রভাতে একটি মেয়ের যে অতুলনীয় ভালবাসা পাইয়াছিলাম, তাহার মত কিছু আর নাই। বিশ্বাস কর, আজ আমার মনে হইতেছে, আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। পরপারের তীরে দাঁড়াইয়া মনে হইতেছে, তাহার স্মৃতিকে জোর করিয়া এত দিন চাপিয়া রাখিয়াছি বটে, কিন্তু হায়! আমার লীলাকে আমি আজও তেমনি ভালবাসি, তাহারি জন্য পথ চাহিয়া আজও মনে মনে বসিয়া আছি।

জানি, তোমরা আমার এই আচরণকে অতি নিন্দনীয় বলিবে। বলিবে,—এমন করিয়া একজন জন্মের ইতিহাস-হীন রমণীকে আজীবন ভালবাসিয়া আমি অপরাধ করিয়াছি এবং যাঁহাকে আমি বিবাহ করিয়াছি তাঁহারও প্রতি অন্যায় করিতেছি। কিন্তু ভাই, মন কি এ সব ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখা মানিতে চায়? তাই বলিয়াছি, পরলোকে যদি ইহার জন্য শাস্তি পাইতে হয়, সহ্য করিব, কিন্তু তাহার আগে লীলাকে যেন আর একবার দেখিতে পাই।

বৈশাখ, ১৩২৫

টেলিফোনের ঘণ্টা

তখন ডাক্তারিতে তাঁর খুব হাতযশ ও মান হইয়াছে। অর্থের ভাবনা ছিল না। ডাক্তার মিত্রকে কলিকাতা শহরে চিনিত না, এমন লোক খুব কম ছিল।

বড় লোক হইলে যেমন হয়, ডাক্তার মিত্র সম্বন্ধে আলোচনা ও মতভেদের আর অন্ত ছিল না। তিনি একা থাকিতেন। অবিবাহিত, সুতরাং নিঃসন্তান। কত টাকা যে তিনি জমাইয়াছেন এবং সেগুলি দিয়া তিনি কি করিবেন, তা অনেকে ঠাহর করিতে পারিত না। অবশ্য জল্পনা-কল্পনা চলিত। কিন্তু তারই বা দৌড় কত দূর? যেমন,

"বয়স ত হয়ে গেল, বিয়ে বোধ হয় আর কর্‌বে না।"

"কে জানে!"

"তা অত টাকা কি কর্‌বে?"

"কোন সৎকাজে টৎকাজে হয় ত দিয়ে যাবে।"

"তুমিও যেমন ক্ষেপেছ! নাস্তিক।..."

"তাতে কি?"

"ওরা কি পুণ্যে বিশ্বাস করে, না স্বর্গ চায়? ওরা শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।"

"না হে না, শোন নি ওর একজন...আছে?"

"সত্যি না কি?"

"তারি পায়ে সব ঢেলে দিয়ে যাবে দেখো।"

ইহার বেশী অগ্রসর হওয়া যায় না। অবশ্য ডাক্তার বাবু যে অতি

নির্ব্বোধ ব্যক্তি, সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁর এত হিতৈষী বন্ধু বর্ত্তমান থাকিতেও তিনি কারো সঙ্গে মিশেন না। "সাহেবী মেজাজ!"

ডাক্তার মিত্র এক দিন রাত্রিতে শুইয়া আছেন, এমন সময় নীচের ঘরে টং টং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ডাক্তারের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি ঘণ্টা-ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। অনেক দিন অনেক রাত্রে তাঁর ডাক আসিয়াছে, সে জন্য তিনি বিস্মিত হইলেন না। তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিত্রের একটা বিশেষত্ব এই যে, তিনি রাত্রে কখনো বাইরে যান না, তা সে যত বড় আর যত জরুরী ডাকই হোক্ না কেন। টেলিফোনের ঘণ্টা ধরিবার জন্য তাঁর একটি চাকর সর্ব্বদাই মজুত থাকে। ঘণ্টা-ধ্বনি থামিতেই ঘুমাইবার জন্য তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

ধীর পদে কেহ তাঁর ঘরে ঢুকিল। পায়ের শব্দে বুঝিলেন তাঁর টেলিফোন চাকর বরাট্। সে কোন দিন তাঁকে এ সময়ে বিরক্ত করিতে আসে না। আজ আসিল কেন?

ভাবিতে ভাবিতে বরাট্ ডাকিল, "হুজুর।"

ডাক্তার আবার এ পাশ ফিরিয়া বলিলেন, "কি চাই?"

"টেলিফোনে আপনাকে ডাক্‌চে।"

"হতভাগা, তুই কি জানিস্ না আমি রাতে বেরুই না? কি চায়?"

"আজ্ঞে বলেছিলাম, কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলে যদি আস্‌তে না পারেন, অন্তত কথা বলা দরকার। বড় জরুরী।"

ডাক্তার বিরক্ত চিত্তে ও অপ্রসন্ন মুখে চটী জুতা পায়ে দিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন এবং টেলিফোনের হাতল কানের কাছে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?"

"আপনিই কি ডাক্তার মিত্র ?"

কণ্ঠস্বরে মনে হইল রমণীর। বড় মধুর, বড় হাল্কা। ডাক্তারের চিত্তের বিরক্তি দূর হইল না, কিন্তু মুখ আর অপ্রসন্ন রহিল না। বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।"

রমণী দ্রুত বলিয়া গেলেন, "এত রাতে আপনাকে···এমন ভাবে আপনাকে···ডেকে বিরক্ত করার জন্য লজ্জা বোধ কর্‌চি, কিন্তু উপায়ও ত নাই। আমি বড় বিপদে পড়েই আপনাকে ডাক্‌চি, যেমনতর বিপদে পড়ে মানুষ ভগবান্‌কে ডাকে,"—শেষের দিকে একটু হাসির আভাস ছিল।

সঙ্গীতের মত সেই মৃদু মৃদু কণ্ঠস্বর স্বপ্নময় স্তব্ধ রাত্রির বুকে বড়ই মানাইল। ডাক্তার মিত্র মুগ্ধ হইলেন। তাঁর চিত্তের বিরক্তি ও গ্লানি দূর হইল এবং মনে হইল সারা রাত ধরিয়া ঐ কণ্ঠস্বর শুনিলেও ক্ষতি নাই।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিপদ্ ?"

"বিপদ্‌টা কি, তাই ত-ভাল করে জানি না ছাই। কিন্তু বুঝ্‌চি বড় গুরুতর। ডাক্তার বাবু, আমার মেয়ে বুঝি আর বাঁচবে না···।" শেষ দিকে তাঁর কণ্ঠস্বরে চোখের জলের আভাস পাওয়া গেল। কত ক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন, "সংসারে ঐ এক মেয়ে আমার, আর কেউ নাই। সেই মেয়ে বুঝি বাঁচে না।"

"অসুখ করেচে কি ?"

"না, কোন অসুখ নাই তার। আমারি দোষ সব। আমার

জন্মই যেতে বসেচে।...আপনি একবার এখনি আস্‌তে পারবেন কি? টাকার জন্য ভাবনা করবেন না...”

“আমার টাকার জন্য কিছুই ভাবনা নাই। কিন্তু আপনি আমার নিয়ম জানেন না কি যে আমি রাতে কোন ডাক নি না?”

“জানি। দয়া করুন, ডাক্তার বাবু, দয়া করুন। যত টাকা চান, দিব।”

ডাক্তার কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। তারপর বলিলেন, “আচ্ছা যাব। আপনার জন্য এই প্রথম নিয়ম ভাঙ্‌ব। আমি একটু পরেই রওনা হচ্চি।” সত্য বলিতে কি, এত সুন্দর যার কণ্ঠস্বর সেই রমণীকে দেখিতে তাঁর কেমন একটু আগ্রহও হইয়াছিল।

রমণী বলিলেন, “ধন্যবাদ—ধন্য...”

“কিন্তু আপনার ঠিকানাটা?”

“ঠিক,—টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর উল্টা দিকে মাঠের মধ্যে যে বড় বাড়ী-খানা আছে সেখানা, তিন তলা—১৩নং।”

“টালিগঞ্জে আবার ও রকম বাড়ী হয়েচে না কি?”

এ কথার কোন উত্তর আসিল না। রমণী হাতল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার মিত্র তখন শিশ্‌ দিতে দিতে বারান্দায় ঠাণ্ডার মধ্যে কতক্ষণ পায়চারি করিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন।

প্রথম চিন্তা, যাওয়া উচিত কি না। কিন্তু যখন কথা দিয়াছেন, তখন যাওয়াই স্থির করিলেন। তারপর কিসে যাইবেন? কেন জানি না, মোটরে যাইতে তাঁর ইচ্ছা হইল না। কাজের ধান্দায় ঘুরেন বলিয়া অনেক দিন তাঁর প্রিয় ঘোড়া ‘চমৎকারে’ চড়েন নাই। আজ ঠিক করিলেন, চমৎকারে চড়িয়া যাওয়াই সব থেকে সুন্দর হইবে। রাস্তা একেবারে পরিষ্কার, বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিবেন। ভাবিতেই তাঁর

বলিষ্ঠ হাত পা ও মন নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি বরাট্‌কে ডাকিয়া সহিসকে ঘোড়া সাজাইতে বলিতে বলিলেন। বরাট্ আশ্চর্য্য হইল।

তৈয়ার হইতে ডাক্তার মিত্রের আরো আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। আলো জ্বালিয়া ঘড়ি দেখিলেন, ১টা বাজিয়া গিয়াছে।

ঘোড়া লইয়া রাস্তায় আসিতেই দেখিলেন, জ্যোৎস্না সমস্ত শহরকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। কলিকাতার গ্যাসের আলোও সে জ্যোৎস্নাকে ম্লান করিতে পারে নাই। চমৎকার প্রভুর স্পর্শ পাইয়া আনন্দে চিঁহীহী করিয়া উঠিল। তখন ডাক্তার মিত্র তার পিঠে চড়িয়া তাকে বায়ুবেগে ছুটাইয়া দিলেন।

ডাক্তার মিত্র পাকা ঘোড়সওয়ার। কিন্তু অনেক দিন ঘোড়ায় চড়িতে পারেন নাই। জনশূন্য রাস্তা, আর মাথার উপর চাঁদ হাসিতেছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার ছাড়াইতেই গায়ে ঘাম দেখা দিল। ডাক্তার মিত্রের মনটা এক অজানা আনন্দে ভরিয়া গেল। আর সে আনন্দ ঘোড়াটাতেও সংক্রামিত হইয়া তাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল।

দেখিতে দেখিতে ডাক্তার মিত্র এবং চমৎকার তাঁদের গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। টালিগঞ্জের ট্রাম ডিপোর উল্টা দিকে একটা মাঠ আছে বটে, তা ডাক্তার বরাবর জানিতেন। কিন্তু সে মাঠের মাঝে বাড়ী, কই, আজও দেখিতে পাইলেন না। ডাক্তার মাঠের প্রান্তে দাঁড়াইয়া অনেক ক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, মাঠে বাড়ীর চিহ্নমাত্র নাই। সবুজ ঘাসের উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া অপরূপ শোভা হইয়াছে।

ব্যাপারখানা কি? ডাক্তার মিত্র নিজে টেলিফোনে কান রাখিয়া সেই মিষ্টি কথাগুলি শুনিয়াছেন, এখনো তাঁর কানে বাজিতেছে। সুতরাং তা মিথ্যা নয়। কিন্তু বাড়ীখানা মিথ্যা হইয়া গেল কেমন করিয়া? ডাক্তার ঘোড়ার উপর চড়িয়াই ভাবিতে লাগিলেন, কিছু

বুঝিতে পারিলেন না। কেহ কি তাঁর সঙ্গে তামাসা করিল? তাই বা কেমন করিয়া হইবে? সেই কাতরতা, সেই করুণ স্বর, এখনো যে মনে পড়িতেছে।

ডাক্তার মিত্র আরো কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মাঠের দিকে আরো একবার ভাল করিয়া দেখিয়া বাড়ীর দিকে ঘোড়া ছুটাইলেন। তিনি নিজে নিজেই আশ্চর্য্য হইলেন যে, তাঁর যতটা ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত ছিল তার কিছুই হইলেন না।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, ঘড়িতে ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ কোথা দিয়া কাটিল ভাল বুঝিতে পারিলেন না। যা হোক্, তাঁর বড় ঘুম পাইয়াছিল। বাতি নিবাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা ১১টা বাজিয়াছে। কাল যে অত কাণ্ড ঘটিল, আজ দিনে মনে হইল তা যেন স্বপ্নের কাণ্ড। তাঁর খুব হাসি পাইল।

কিন্তু স্বপ্ন হোক্ সত্য হোক্ ডাক্তার মিত্র দেখিয়া অবাক্ হইলেন যে, তিনি মনে মনে সারা দিন সেই আশ্চর্য্য রমণীর খবরের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ঘুম হইতে উঠিয়াই বয়়াট্‌কে প্রশ্ন করিলেন, "আমার খোঁজে এসেছিল কেউ, কি টেলিফোনে ডেকেছিল?"

"আজ্ঞে হাঁ—অনেকে—এই..."

তার লম্বা ফর্দ্দের জ্বালায় অস্থির হইয়া ডাক্তার বলিলেন, "না না, আমি তা বল্‌চি না, হতভাগা, কালকে রাতে যারা ডেকেছিল..."

"আজ্ঞে না।"

সারা দিন আরো কয়েক বার খবর করিলেন। কিন্তু না, তাদের কেউ তাঁকে আর ডাকে নাই। সে দিন ডাক্তার বাহিরে মোটেই গেলেন না এবং অনেক ডাক ফিরাইয়া দিলেন। যেগুলি কাছে এবং তাড়াতাড়ি সারা যায় সেগুলি শুধু সারিয়া আসিলেন।

কিন্তু সারা দিনের মধ্যে সেই আশ্চর্য্য রমণী আর কোন কথা কহিল না। সারা দিন এক রকম ঘরে বসিয়া থাকিয়া ডাক্তার মনে মনে বড় অস্বচ্ছন্দ অনুভব করিলেন। তারপর এই হেঁয়ালি তাঁকে একটুখানি ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

কেমন মা সে! গভীর রাতে মেয়ের জন্য সে আকুল প্রাণে ডাকাডাকি করিল ডাক্তারকে, আর স্পষ্ট দিবালোক বহিয়া যাইতেছে, শেষ হইয়া গেল, এর মধ্যে কি ডাক্তারকে মনে পড়ে না?

বাস্তবিকই সমস্ত দিন বহিয়া গেল। রাত্রি আসিল। আলো জ্বলিল। তারপর ডাক্তার শুইলেন এবং ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ঠিক গভীর রাতে আগের দিনের মত টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ডাক্তার উঠিলেন, আলো জ্বালিলেন, দেখিলেন ১২½ টা বাজিয়াছে।

বরাট্ আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রে?"

"সেই কালকের মেয়ে মানুষটি হুজুর···"

কোন কথা না কহিয়া ডাক্তার মিত্র নীচে নামিয়া গিয়া টেলিফোনের হাতল তুলিয়া কানে দিলেন, "কে?"

"আমি চন্দ্রাবতী।"

সেই স্বর। বুঝিলেন, তাঁর নাম চন্দ্রাবতী। ডাক্তার একটু ঝোঁকের সঙ্গে বলিলেন, "বেশ যা হোক্। আপনার গুরুতর বিপদের কথা শুনে আমি আমার নিয়ম ভঙ্গ করেও আপনার বাড়ীর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলাম···"

"মিছে কথা, আপনি ত আসেন নি। আমি সারা রাত চোখের জলের মধ্যে অপেক্ষা করেছিলাম। তবু আপনি আসেন নি।"

ডাক্তার রীতিমত রাগত ভাবে বলিলেন, "মিছে কথা আমার না

আপনার? আপনি বল্লেন, টালিগঞ্জের ট্রাম ডিপোর উল্টা দিকে ১৭নং তেতলা বাড়ী আপনার। কই, কাল ত সেখানে গিয়ে দেখ্‌লাম-মাঠই ধূ ধূ কর্‌চে, বাড়ী ত নাই।

রমণী করুণ স্বরে বলিলেন, "আহাহা, কে আপনাকে ভুল বলে দেছ্‌ল, রাত করে কষ্ট পেলেন। আমার বাড়ী ত টালিগঞ্জে নয়। আমার বাড়ী বেলগাছিয়া। ১৬নং দোতলা বাড়ী। ভুবনচন্দ্র উকীলের বাড়ীর পরেই।"

অবাক্! কাল বলিল টালিগঞ্জে আর আজ বলে কি না ১৬নং বেলগাছিয়ায়। কোথায় টালিগঞ্জ আর কোথায় বেলগাছিয়া!

ডাক্তার বলিলেন, "কিন্তু আপনিই ত বল্লেন যে আপনার বাড়ী টালিগঞ্জে। দেখুন দেখি অতটা দূর..."

রমণী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি কখনো বলি নি। আপনার শুন্‌তে ভুল হয়েচে।"

তখন হঠাৎ ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আপনি কি কালকের তিনি নন?"

"তিনিই। আমারই মেয়ের অসুখ।"

ডাক্তার বলিলেন, "কে আমার সঙ্গে তামাসা কর্‌চেন? এ রকম তামাসায় যে প্রাণান্ত হয়ে দাঁড়াবে। আপনি আজ সারা দিন দিনের বেলায় আমায় ডাক্‌তে পার্‌লেন না? আমি অপেক্ষা করে ছিলাম।"

রমণী কণ্ঠস্বরে কোমলতা ভরিয়া দিয়া বলিলেন, "ক্ষমা করুন, ডাক্তার বাবু, আমি বড় দুঃখী। আমি আপনাকে দিনের বেলা ডাকি নি,—আমার মেয়ে সারা দিনটা বেশ ভাল থাকে। প্রতিদিন মনে হয়, এই বুঝি ভাল হয়ে গেল। কিন্তু রাত হলেই আবার তার অসুখ আরম্ভ হয়।"

"অদ্ভুত অসুখ!"

"কি কর্‌ব বলুন। কিন্তু আজ একবার দয়া করে আস্‌বেন কি? আপনার পায়ে পড়ি আসুন। বাছা বুঝি বাঁচে না।" তাঁর কান্না শোনা গেল।

মেয়ের জন্য নহে, কিন্তু রমণীর কণ্ঠস্বর তাঁকে অভিভূত করিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হইয়া তিনি যাত্রা করিলেন।

আজও ঘোড়ায় চড়িয়া, কিন্তু অন্য পথ। আজও তাঁর হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং চমৎকার উৎসাহিত হইয়া বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল। সারা দিন ঘরে অলস ভাবে কাটাইয়া শরীরটা খারাপ হইয়াছিল। সুতরাং এই মুক্ত হাওয়া ও জ্যোৎস্না আলোতে ছুটিয়া তিনি অত্যন্ত আরাম অনুভব করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার মিত্র ভুবনচন্দ্র উকীলের বাড়ী ছাড়াইলেন, তারপর ১৬নং বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন চমৎকারের ঘাড়ের লোম সব ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, আর ডাক্তার বাবুর কপাল দিয়া দর্ দর্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। তিনি চমৎকারের পিঠ চাপড়াইয়া আদর করিয়া ডাকিলেন, "চমৎকার!" চমৎকার চিঁহীহী করিয়া ডাকিল।

তখন মিত্র ১৬নং ঘরের কাছে ঘোড়া হইতে নামিলেন। হাঁ, বেশ বড় লোকের বাড়ী বলিয়াই মনে হইতেছে বটে। কিন্তু ও হরি! ফটক যে তালাবন্ধ। সমস্ত বাড়ীখানা স্তব্ধ হইয়া জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও আলো জ্বলিতেছে না, মানুষের সাড়াশব্দ পর্য্যন্ত নাই। সেখানে যে ইতিপূর্ব্বে লোক ছিল, তার কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না।

ডাক্তার মিত্র বিরক্ত হইলেন। এ আবার কি? যা হোক্ তিনি তখন ফটকের তালা ধরিয়াই নাড়িতে লাগিলেন,

"বাড়ীতে কেউ আছেন?"

"এ বাড়ীতে কেউ মালিক আছে?"

তিনি অনেক বার ডাকিলেন। কিন্তু তাঁর ডাকই শুধু সার হইল। সেই স্তব্ধ নৈশ গগনে তাঁর নিজের স্বরই তাঁর কাছে অদ্ভুত স্বপ্নময় মনে হইতে লাগিল। তাঁর খুব ইচ্ছা হইল যে, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, কিন্তু তাঁর রাগ হইল না। তাঁর মনটা প্রীতিতে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি আসিয়া চমৎকারের গলা ধরিয়া তাকে একটা স্নিগ্ধ চুম্বন করিলেন। তারপর আর কিছু না ভাবিয়াই বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন।

বাড়ী ফিরিয়া শুইতে যাইবার আগে ঘড়ি দেখিলেন, ৪টা বাজিয়াছে। কল্যকার মত আজও তাঁর খুব ঘুম পাইয়াছিল। তিনি বিছানায় আসিয়া শুইলেন। একবার তাঁর মনে হইল এ কি ঠাট্টা না ভূতে পাইয়াছে? তারপর ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ঘুম হইতে উঠিতে তাঁর আবার ১১টা বাজিয়া গেল। সে দিন সারা দিন ধরিয়া ঠিক আগের দুই দিনেরই মত তিনি ব্যাকুলতা অনুভব করিলেন, বার বার করিয়া খোঁজ লইলেন তাঁর ডাক পড়িয়াছে কি না। সেই আশ্চর্য্য রমণীর মধুর কণ্ঠস্বর তাঁকে মদিরার মত আবিষ্ট করিয়া রাখিল। অন্ধকার হইয়া আসিতেই তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্তি অনুভব করিলেন। স্থির করিলেন, আজ রাতে সেখান হইতে যদি আবার টেলিফোনের ঘণ্টায় ডাকিয়া পাঠায় তা হইলে তিনি ত যাইবেনই না, টেলিফোনে জবাব পর্য্যন্ত দিবেন না।

কিন্তু গভীর রাতে আবার যখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং বরাটু আসিয়া জানাইল, "সেই তিনি," তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

চন্দ্রাবতী কথা কহিলেন। তাঁর স্বর আজ আরো মিষ্ট, আরো কোমল। ডাক্তার মিত্র সুরের ঝঙ্কারে মোহিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, "তোমার কথা শুন্‌লে কোন্ বেটার সাধ্য রাগ করে!"

কিন্তু তবু তিনি রাগ দেখাইতে ছাড়িলেন না। বলিলেন, "আবার কি চান?"

চন্দ্রাবতী যেন গান গাহিয়া বলিলেন, "কথা দিয়ে কথা রাখ না, কেমন ডাক্তার তুমি? মিথ্যাই তোমার এত নাম হয়েচে।" 'তুমি'! কিন্তু ঐ রমণীর মুখে তুমিই ভাল শোনায় যে।

কিন্তু ডাক্তার মুস্কিলে পড়িলেন, তুমি না আপনি সম্বোধন করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় চন্দ্রাবতী আবার বলিলেন, "এলেন না যে?"

ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "দেখুন, কে আমার সঙ্গে খেলা কর্‌চেন জানি না। মিছামিছি আমায় রাত করে প্রতিদিন হয়রাণ করে মার্‌চেন কে?"

"আমি যদি বলি ভূতে?"

"সে কথা বিশ্বাস করা একটু শক্ত বটে। এমন রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে যিনি কথা বল্‌চেন, এত মিঠা যাঁর আওয়াজ, তিনি আর যাই হোন্ ভূত কখনো নন্, এটা ঠিক। তবে আর দিন দুই এমন করে ঘোরালে আমায় ভূতে পাবে নিশ্চয়।"

কিন্তু চন্দ্রাবতীর তরল কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া গেল। কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ডাক্তার বাবু, বাঁচান আমার মেয়েকে বাঁচান, সে বুঝি যায়! আপনি এখনি আসুন।"

মিত্র কহিলেন, "আপনার কথা বুঝ্‌তে পারি না। মেয়েকে বাঁচানো আমার সাধ্য নাও হতে পারে, কিন্তু তাকে বাঁচানো আপনার উদ্দেশ্য বলে ত মনে হয় না।"

"নিষ্ঠুর, এত নিষ্ঠুর আপনি, ডাক্তার বাবু! ঐ আমার একমাত্র মেয়ে।" তাঁর স্বর কান্নায় বন্ধ হইয়া গেল।

ডাক্তার বিব্রত ভাবে বলিলেন, "কাঁদবেন না, আপনাকে কষ্ট দিবার

জন্য ও কথা বলি নি। দু'দিন আগে থেকে আপনি বল্‌চেন আপনার মেয়ে মরে, অথচ ঠিক সন্ধানটা দিচ্চেন না। আমার কি দোষ?"

"কাল ত ঠিক সন্ধান দিয়েছিলাম।"

"কি বলুন ত?"

"টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর উল্টা দিকে মাঠের মধ্যে ১৩নং বাড়ী।"

ডাক্তার বসিয়া পড়িলেন। হতাশ ভাবে বলিলেন, "কাল যে বল্লেন, বেলগাছিয়া, ভুবনচন্দ্র উকীলের পরের বাড়ীখানা—নং ১৬। আর আজই সব বদ্‌লে গেল?"

চন্দ্রাবতী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "আহাহা, কে আপনাকে ভুল ঠিকানা দিয়ে দিল! আমি ত কখনো বলি নি ও ঠিকানা। আমার দিব্য, আপনি টালিগঞ্জে এসে মাঠের মধ্যে ১৩নং বাড়ীতে দেখা করুন। আমার মেয়েটাকে বাঁচান।"

ডাক্তার মিত্রের দৃঢ় প্রত্যয় হইল, কেহ তাঁকে লইয়া নিশ্চয় রসিকতা করিতেছে। এ কথা ভাবিয়া তাঁর খুব রাগ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি রাগ করিতে পারিলেন না, হাসিয়া ফেলিলেন। তাঁর আগের হতাশাও দূর হইল। তিনি বলিলেন,

"ঠিক ত? এবার আর মিথ্যা বল্‌চেন না?"

চন্দ্রাবতী সহজ সুরে বলিলেন, "আমি আপনাকে কখনো মিথ্যা বলি নি। আপনি একেবারে মাঠের মাঝখান অবধি চলে যাবেন, ভয় করবেন না।"

"ভয় আমি কখনো করি নি।"

"বেশ বেশ। বাইরে চাকর দরোয়ান নাই। হয় ত ততক্ষণে আলোও সব নিবাবো। মেয়ের আমার আলো চোখে সয় না। আপনি ধীরে ধীরে তিনতলায় উঠে যাবেন।"

"বেশ।"

"তবে আপনি এখনি রওনা হোন্।"

ডাক্তার মিত্র চিন্তিত মুখে ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশী ক্ষণ ভাবিতে পারিলেন না। তারপরেই দেখা গেল সেই নিস্তব্ধ রাতে ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং চমৎকারের পিঠে মিত্র বায়ুবেগে উড়িয়া চলিলেন।

জ্যোৎস্নায়, পরিশ্রমে এবং প্রিয় অশ্বের হ্রেষা রবে যখন তাঁর মনে আনন্দটা খুব জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি টালিগঞ্জের মাঠে আসিয়া পৌছিলেন। পৌছিয়াই দেখিলেন, মাঠের মাঝখানে একটা তিনতলা বাড়ী মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আশ্চর্য্য! পরশু দিন ত এখানে কোন বাড়ীর চিহ্নমাত্র ছিল না, তিনি এ কথা হলফ্ করিয়া বলিতে পারেন্। কিন্তু আজ এ বাড়ী কোথা হইতে আসিল? আলাদিনের প্রদীপ কি সত্য সত্য তাঁর জীবনে কাণ্ড করিবার জন্য আসিল?

কিন্তু বেশী ভাবিবার সময় ছিল না। তিনি চমৎকারকে কদমে চালাইয়া সেই বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চমৎকারের পিঠ হইতে নামিয়া তাকে আদর করিলেন ও একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিলেন। তারপর একটা দেশলাই জ্বালিয়া দেখিলেন, হাঁ, ১৩ নং বাটীর সাম্‌নে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে বটে। যতক্ষণ দেশলাইর কাটির আলোটুকু ছিল তারই মধ্যে যতটুকু পারিলেন বাড়ীটা দেখিয়া লইলেন। তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ী। কোন্ কোঠায় যে তারা আছে কে জানে?

সমস্ত বাড়ী অন্ধকার, মনে হয় জনপ্রাণী একটাও নাই। মাথার উপর চাঁদ হাসিতেছে। ডাক্তার মিত্রের একটু শীত শীত করিতে লাগিল। কোটের বোতামগুলি ভাল করিয়া আঁটিয়া দিলেন।

কোন আলো জ্বলিতেছিল না। অথচ বাড়ীতে ঢুকিতে বা তার সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে তাঁর কিছু কষ্ট হইল না দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন।

তিনি সিঁড়ি বাহিয়া সোজা তেতলার ঘরে উঠিয়া গেলেন। তারপর একটার পর একটা কোঠা পার হইতে লাগিলেন। কোঠাগুলিতে কোথাও আলো নাই, অথচ অন্ধকারও নহে। তিনি কত কোঠা যে পার হইলেন তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তবু কোথাও কোন জনপ্রাণীর সাড়া পাইলেন না।

তখন তাঁর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। ভাবিলেন, চন্দ্রাবতী আজও তাঁকে ফাঁকি দিয়াছে। কিন্তু আজও তিনি রাগ করিতে পারিলেন না, হতাশ্বাস হইলেন না।

তারপর তাঁর মনে পড়িয়া গেল চন্দ্রাবতীর আশ্চর্য্য সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের কথা। অমনি দেখিতে পাইলেন তিনি একটা প্রকোষ্ঠের সাম্নে দাঁড়াইয়াছেন, দরজায় পর্দা টাঙ্গান, আর পর্দার উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে। সেই ঘরের মধ্য হইতে চুলের গন্ধ, দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ ও পোষাকের খস্ খস্ আওয়াজ তাঁর কানে আসিয়া বাজিল।

তিনি ধীরে ধীরে দেওয়ালে টোকা মারিলেন।

ভিতর হইতে গানের আওয়াজে প্রশ্ন হইল, "কে? ডাক্তার বাবু?" চন্দ্রাবতীর কণ্ঠস্বর!

"হাঁ।"

"ভিতরে আসুন।"

ডাক্তার পর্দা সরাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন। তাঁর যেন মনে হইল তিনি বাস্তব ছাড়িয়া কোন ছবির রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘরের মধ্যে আধো আলো, আধো ছায়া। আলোর মধ্যে এক অতি শোভাময়

সোফার উপর এক অতুলনীয় রমনী-মূর্ত্তি শয়ান আছে। অনুমানে বুঝিলেন, ইনিই চন্দ্রাবতীর কন্যা।

ছায়ার মধ্যেও এক জন কেহ বসিয়া আছে, তাকে ভাল করিয়া বুঝা যাইতেছে না। ডাক্তার বাবুর মনে হইল,এ চন্দ্রাবতী না হইয়া যায় না। তিনি ছোট একটি নমস্কার করিলেন। ছায়াও গানের ঝঙ্কারে বলিয়া উঠিল, "বসুন, ডাক্তার বাবু, বসুন।"

ডাক্তার মিত্র বসিলেন। কিন্তু কোথায় বসিলেন, কি করিয়া বসিলেন, মনে রহিল না। শুধু বুঝিলেন, তাঁর মনটা এক অনাবিল আনন্দে ভরিয়া গেল।

তারপর চন্দ্রাবতীর কন্যার দিকে চাহিলেন। "কি অসুখ তোমার, মা?

কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তাঁর চোখের সাম্‌নে" এক অপরূপ মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মানুষের শরীরে এত সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে তিনি কখনো কল্পনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু কি শীর্ণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত চেহারা ঐ মেয়েটির! মানুষ যে এত রোগা থাকিতে পারে তাও আগে তিনি জানিতেন না।

সেই লতার মত মূর্ত্তির মধ্যে অসীম সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁর প্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইল এবং মুখখানা হাস্যশ্রীতে ভরিয়া গেল।

চন্দ্রাবতীর কন্যা বলিল, "ডাক্তার বাবু, আমি আর বাঁচব না।"

এই কণ্ঠস্বর! এর কাছে যে মায়ের গলাও কর্কশ হইয়া যায়! ডাক্তার বাবু ভাবিতে লাগিলেন, এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িতার মধ্যে এত রূপ, এ কণ্ঠস্বর কি করিয়া সম্ভব হইল।

"ডাক্তার বাবু, আমি আর বাঁচব না।"

ঐ কণ্ঠস্বরে তাঁর মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। "বাঁচবে না কেন? কি হয়েচে বল ত?"

"কি হয়েচে আমিই কি ছাই জানি? আমার মন খারাপ হয়েচে, ডাক্তার বাবু।"

অসুখের কথা শুনিয়া ডাক্তার হাসিয়া উঠিতে চাহিলেন, কিন্তু হাসিতে পারিলেন না। শুধু বলিলেন, "এই?"

ডাক্তার বাবুকে আশ্চর্য্য করিয়া চন্দ্রাবতী বলিলেন, "না, হাস্‌বেন না, আগে শুনুন..."

"আমি হাস্‌লাম কখন?"

চন্দ্রাবতীর কন্যা বলিল, "দেখুন, আমি বেশ বঝ্‌তে পারি, আমি দিনে দিনে কেমন শুকিয়ে যাচ্চি। আমার কোন রোগ নাই, কিচ্ছু নাই, তবু...। দিনের বেলা প্রতিদিন মনে হয়, কিছু না, ভাল হয়ে যাব। কিন্তু রাত হলেই কিসে পেয়ে বসে জানি না।" মেয়েটি কাঁদিতে লাগিল।

তার রক্তহীন শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার বাবু ভাবিতে লাগিলেন।

চন্দ্রাবতী বলিলেন, "উপায় কি, বলুন।"

ডাক্তার তবু ভাবিতে লাগিলেন।

তখন মেয়েটি কণ্ঠস্বরে অনুনয় ভরিয়া বলিতে লাগিল, "আমি জানি, ডাক্তার বাবু, কিসে আমার অসুখ সার্‌বে। এই মন-খারাপ হওয়া। আমি ভালবাস্‌বার লোক পাই না, তাই এমন করে মর্‌তে বসেচি। আজ আপনি যদি দয়া করে এসেচেন..."

ডাক্তার বাবু তার কথা শুনিয়া ও ভঙ্গী দেখিয়া পিছু হটিতে লাগিলেন। সে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া দুই হাত ডাক্তারের দিকে প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইল।

ডাক্তার মিত্র তাকে এক ঠেলা দিতেই সে উপুড় হইয়া পড়িল। তিনি আর সে দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সেই

গোলক ধাঁধাঁর পথ বুঝিয়া বাহিরে আসিতে তাঁর অনেক ক্ষণ চলিয়া গেল। তারপর চমৎকারের পিঠে চড়িয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন।

বাড়ী পৌঁছিতেই দেখিলেন, ভোর হইয়া গিয়াছে ও ঘুম পাইয়াছে। তিনি আরামে নিদ্রা গেলেন।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া একখানা কাগজ খুলিতেই দেখিলেন বড় বড় করিয়া লেখা রহিয়াছে, "অত্যাশ্চর্য্য হত্যাকাণ্ড! পুলিশ টালিগঞ্জের মাঠে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরীর মৃতদেহ পাইয়াছে। কিন্তু কি করিয়া তার মৃত্যু হইল, কিছুতেই নির্ণয় করিতে পারিতেছে না..."

সর্ব্বনাশ! ডাক্তার মিত্র শিহরিয়া উঠিলেন। কলিকাতা শহরে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। মিত্র আদালতে সকল কথা প্রকাশ করিয়া সে যাত্রা অতি কষ্টে রক্ষা পাইলেন।

সেই হইতে মিত্র আর কখনো রাতে টেলিফোনের হাতল বসাইয়া রাখেন না। আর ইহার পর অবনীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকিতে লাগিলেন, এবং লোকে তাঁর আঁকা মূর্ত্তির ব্যঙ্গ করিত, তিনি বলিতেন,—"ভদ্রলোক সৌন্দর্য্যের মর্ম্ম ঠিক বুঝেচেন।"

অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।

কবরের উপর

নরেন প্রত্নতাত্ত্বিক নহে। তবু সে মুসলমান নর-নারীর কবর খুঁজিয়া বেড়াইতে ভালবাসিত। কেন, অবশ্য তার একটা কারণ আছে। সে যা বলে তা অত্যন্ত হাস্যজনক এবং অবিশ্বাস্য। সে বলে, আমার মনের মধ্যে যে একটা গল্প শুন্‌বার পিপাসা রয়েছে তা তৃপ্ত হয়।

"মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রের গল্প পড় না কেন?"

"ছোঃ, মাসিক-সাপ্তাহিকের গল্প আবার গল্প! একবার পড়্‌লে দ্বিতীয় বারে বমি কর্‌তে ইচ্ছা করে। আর এগুলি দেখ ত কেমন। প্রতি কবর থেকে আমি মনের জন্য অফুরন্ত খোরাক পাই। এক একটি কবর এক একটি ছোট গল্প।

"লিখ না কেন?"

"লিখে লাভ?"

"ছাপাবে।"

নরেন রুষ্ট হইয়া চাহিয়া থাকে। লিখিতে সে নারাজ এবং লেখকের উপর চটা। তার নিন্দকের স্বভাব সর্ব্বত্র দোষ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়।

বাস্তবিক, নরেনের মত যদি মানিতে হয়, হিন্দুরা মৃতদের পুড়াইয়া ফেলিয়া একটা অত্যন্ত অসুন্দর কাজ করে,—কত কবিতা কত গল্প যে সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায় তা কে জানে! হিন্দুর সাহিত্য যত বড় হোক্ কখনো পূর্ণ হইতে পারিবে না। এ বিষয়ে খৃষ্টান ও মুসলমানেরা বুদ্ধিমান্ জাত। তার মতে, তাদের উন্নতি বেশী হইয়াছে।

নরেনের এই খেয়াল তাকে সময়ে অসময়ে স্থানে অস্থানে টানিয়া লইয়া যাইত। মনে কর, সে খবর পাইল, গাজিপুরে মুসলমানদের পুরাণা

কবর আছে। আর যায় কোথা? ট্রেণে চড়িয়া সে গাজিপুরে উপস্থিত তারপর ঘোর অমাবস্যার রাত্রিতে (শীত কাল হইলেও ক্ষতি নাই) দেখা গেল, সঙ্গীহীন নরেন একটা লণ্ঠন হাতে উর্দ্ধশ্বাসে সেই কবরখানার দিকে চলিয়াছে। ধন্য সাহস!

বন্ধুরা বলিত, "কবরে পাইয়াছে।" নরেন এক প্রকার মনোহর হাসি হাসিত মাত্র, উত্তর দিত না।

যে ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক নয় তার কাছে শাহান্ শাহার কবরের মূল্য যা, দরিদ্র কৃষকের কবরের মূল্যও তাই। কোন্টা কার কবর সে খোঁজের সে ধারও ধারে না। তবে কি না তার রক্তের মধ্যে অভিজাত বংশের কিছু ছিল, তাই পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল এবং সুনির্ম্মিত কবরগুলি তাকে বেশী আকর্ষণ করিত, সন্দেহ নাই। সময় সময় অবজ্ঞাত নির্ধনের অনেক কবর যে তার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইত, তা অস্বীকার করা যায় না।

ইতিমধ্যে আমরা একদিন সকলে মিলিয়া তাসের আড্ডা বসাইয়াছি, এমন সময় নরেন সেখানে আসিয়া উপস্থিত। নরেনকে আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু সে দিন তাকে এক নূতন রূপে দেখিলাম। তার উজ্জ্বল চোখ ও সর্ব্বাঙ্গের তীক্ষ্ণতা আমাদের চেতনায় আঘাত করিল। বলিলাম, "নরেন যে!"

নরেন ভূমিকা না করিয়াই বলিল, "তাস বন্ধ কর।"

"কেন?"

"আজ তোমাদের এক মজার কাহিনী শোনাব।"

"কিসের?"

"কবরের।"

"তুমি কাহিনী পাবে কোথা? তুমি ত মন থেকে তৈরি করবে।"

"না হে না।"

"তবে?"

"রক্তমাংসের বলা রক্তমাংসের কথা।"

পরম লোভনীয় তাস খেলাও বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের মনের মধ্যে গল্পের জন্য কি তৃষ্ণাটাই না সঞ্চিত হইয়া আছে! সেই ছেলে বেলা ভাল করিয়া জ্ঞান না হওয়া হইতে বুড়া বয়স পর্য্যন্ত কোন লোককে আজ পর্য্যন্ত বলিতে শুনিলাম না, সে গল্প শুনিতে ভালবাসে না। যত শোনা যায়, আরো শুনিতে ইচ্ছা করে, অবশ্য ভাল লাগিলে।

নরেনকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কতগুলি কবর এ পর্য্যন্ত সে দেখিয়াছে।

উত্তর হইল, "৩০৮টা।" এই বলিয়া পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিল। তারপর উকীলের মত এক একবার সেই কাগজগুলির দিকে তাকাইয়া সে তার কাহিনী বলিয়া চলিল।

নরেন এ পর্য্যন্ত ৩০৮টা কবরের হিসাব লইয়াছে, দেখিয়া ফেলিয়াছে! সে বড় কম কথা নহে। সত্য বটে, অনেক মুসলমান নর এবং অনেক মুসলমান নারী ইহার মধ্যে মরিয়াছে এবং তাদের কবরের সংখ্যা ৩০৮এর চেয়ে বেশী। কিন্তু মনে করিয়া দেখ,—কত অল্প নর-নারীর জীবনেই না উপভোগ করিবার রস আছে! সে কথা চিন্তা করিলে নরেন কি করিয়া ইহাদের মধ্যে ৩০৮টা গল্প খুঁজিয়া পাইল, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় না কি?

কিন্তু নরেন পাইয়াছে। তা না হইলে মিথ্যার পিছনে ছুটাছুটি করিবার মত ছেলে নরেন নয়। ইহাদের প্রত্যেকের জীবন এক একটি গল্প বটে, কিন্তু সে গল্প স-রব নয়। ঐ মূক ভাষাহারা কবরগুলির নিকট হইতে নরেনকে কত কষ্ট ও ধৈর্য্য স্বীকার করিয়াই না তাদের কাহিনী-গুলি উদ্ধার করিতে হইয়াছে!

ইহাদের উপর কত রকম হাতের ও মনের লেখাই না পাওয়া যায়! কোথাও হয় ত লেখা রহিয়াছে,

আ পিয়ারী! মরিয়াছ, বেশ করিয়াছ!
তুমি ত কত সুখে আছ।
আমায় কেন ডাকিয়া লও নাই।

অথবা

স্বর্গের সুখ কি আমার বুকের চেয়েও
তোমার কাছে কোমল লাগিল?
আমার চুমায় তুমি না আঙুর ভুলিলে?
তবে প্রাণের পাখী প্রাণের পাখী
করিয়া ডাকাডাকি
করি, সাড়া পাই না কেন?

কিংবা

বুঝিয়াছি স্বর্গের অপ্সরী
তোমার মন মজাইয়াছে, তাই ছাড়িলে।
কি আর করিব? সুখে থাক।

ইত্যাদি।

এগুলি দেখিতে কবিতার মত, কিন্তু বাস্তবিক কবিতা নহে। কিন্তু ইহাদের মূল্য অনেক। এই হাতের লেখা পড়িয়াই ত নরেন কত বুকের লেখা গোপন কাহিনী বাহির করিয়াছে। তোমার গল্প-লেখকেরা গর্ব্ব করে, গণিয়া গণিয়া বলে, অতগুলি গল্প লিখিয়াছে। আসুক্ ত নরেনের সঙ্গে, লিখুক্ দেখি ৩০৮টা গল্প, কে পারে! নরেন ঠিক জানে, কেউ পারিবে না। তবে নরেন নিজে যে লেখে না, তার কারণ তার নাম করিবার ইচ্ছা নাই।

হাঁ, নরেন বলিতেছিল তার ৩০৮টা গল্পই বলিয়াছে ভাষাহারা কবর-গুলা। কিন্তু এবারকার কাহিনী রক্তমাংসের নিজের মুখে বলা! একটু নূতন বটে।

"তোমরা জান বোধ হয়, আমি এ বার বাঁশপুর বলে এক নূতন জায়গায় গিয়েছিলাম।"

"সেটা কোথায়?"

"আ, তোমাদের যা ভূগোল-জ্ঞান। থাক্ সে আর জেনে কাজ নাই। মুসলমানদের একটা পুরাণা কবর আছে, যেম্নি এ খবর পাওয়া অম্নি রওনা হওয়া। তখন আমার মনের মধ্যে কি আগ্রহ, উত্তেজনা আর উৎসাহ কাজ কর্‌ছিল বুঝ্‌তেই পার। আমি তিন দিন প্রায় না খেয়ে পাগলের মত সে কবরের খোঁজ করেছিলাম।"

"পেয়েছিলে?"

"নিশ্চয়।" নরেনের মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বাঁশপুর কেন নাম হইয়াছে জান? শুক্‌না খট্‌খটে সরু মেটে পথ বরাবর চলিয়া গিয়াছে, কোথায় তা কেউ জানে না। আর দু ধারে শুধু বাঁশের ঝাড়, যতই আগাইয়া যাও বাঁশের ঝাড় পাইবে। বাতাসে মাঝে মাঝে বাঁশের মধ্য দিয়া এমন এক অদ্ভুত স্বর বাহির হয়, মনে হয়, কোথায় যেন কাছে ছোট ছেলে কাঁদিতেছে। মধ্যাহ্ন আর রাত্রিটা কি নির্জন! একবার নরেন কি রকম ভয় পাইয়াছিল, সেই হাসির গল্প অন্য দিন হইবে।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, বাঁশ-ঝাড়ের পরেই নদী, রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে। ও পারে চর। সমস্তটা বেশ কবিত্বপূর্ণ। এই হইল বাঁশপুর গ্রাম।

এই গ্রামেরই একটি কবর। বাঁশ-ঝাড় ছাড়াইয়া নদী পর্য্যন্ত যে

ফাঁকা জায়গাটুকু আছে, তাহাই স্থানীয় মুসলমানেরা কবরের জন্য ব্যবহার করিতেছে। শোনা যায়, ইহার সহিত পাঁচ শ বছরের ইতিহাস জড়িত।

"এই কবর-স্থানটা খুঁজে বার কর্‌তে আমায় কি হয়রাণই না হতে হয়েছিল। আমি জানি, আমাকে এটা টান্‌ছিল, আমার জন্য কবর-গুলির ভিতর মৃত-আত্মারা উন্মুখ হয়ে বসেছিল। অথচ একটা দুষ্টগ্রহ আমাকে বার বার ঠকাচ্ছিল। ঘুরে ফিরে অনেক বার কাছ দিয়ে চলে গেছি, অথচ দেখ্‌তে পাই নি।"

"গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা কর নি কেন?"

"গ্রাম যে জনশূন্য, কাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব?"

"তাই ত!"

"তারপর যখন পেলাম সে তৃতীয় দিন মধ্যরাত্রে। তখন সমস্ত পৃথিবী চাঁদের আলোতে প্লাবিত হয়ে গেছে, বাঁশঝাড়গুলি ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে, নদীর জল জ্বল্‌ছে, দূরে বালুর চর চক্‌চক্ কর্‌ছে, আর সাম্‌নে কবরগুলি সাদা কাপড় পরা মানুষের মত বসে রয়েছে। সে দৃশ্য আমি জীবনে ভুল্‌তে পার্‌ব না। ভাই, অনেক অখ্যাত বিখ্যাত কবর আমি আবিষ্কার করেছি, কিন্তু কোন দিন কোন কবর আবিষ্কার করে আর এত আনন্দ পাই নি।

"আমি তখনি ছুটে গিয়ে একটা কবরকে মানুষের মত আলিঙ্গন করে ধর্‌লাম, ভাই ভাইকে অত স্নেহে আলিঙ্গন করে না।"

এইরূপ মন্ত্রাহত অবস্থায় নরেন কতক্ষণ ছিল বলিতে পারে না। সে বলিতেছে, অল্পক্ষণের জন্য সে স্মরণ-শক্তি হারাইয়া ছিল। এই অল্পক্ষণে সে এইমাত্র বলিতে পারে, বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই।

তারপর, কত ক্ষণের পর সে শুনিল, তার পিছন হইতে কে

ডাকিতেছে, "বাবু জী।" ফিরিয়া দেখে লাল টুপি পরা ২৫।২৬ বছরের একজন মুসলমান যুবক। নরেন বিচলিত হইল না। বলিল:

"এত রাত্রে?"

"আপনিই বা এত রাত্রে কেন আসিয়াছেন?"

নরেন দেখিল, লোকটা বইএর ভাষায় কথা কহিতেছে। ভাল, তাহাই হউক। উত্তর করিল, "গরজ আছে।"

"কি গরজ?"

"বলিব না।"

"নাম?"

"বলিব না।"

"ধাম?"

"বলিব না।"

"ব্যবসা?"

"কবর দেখিয়া বেড়ানো।"

"ওঃ বুঝিয়াছি।"

"কি বুঝিয়াছ?"

যুবক তখন আপনার বক্ষস্থলে তার একটি হাত রাখিয়া বলিল, "বাবু জী, এই ব্যবসা ছাড়িয়া দিন। বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে।" তার কণ্ঠস্বর করুণ হইয়া আসিল।

নরেন বলিল, "আমি ৩০৮টা কবর এমন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছি, তুমি জান না।"

এমন সময় সেই যুবাটি অসহ্য বেদনায় 'অহহ' করিয়া উঠিল। নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

"কাছে আসুন, বলিতেছি।"

নরেন কাছে আসিতেই দেখিতে পাইল, সেখানে একটি কবর রহিয়াছে,—মলিন, ভগ্ন এবং অত্যন্ত দৈন্যের পরিচায়ক। নরেনের নাসিকা কুঞ্চিত হইল। তা দেখিয়া ভদ্রলোক বলিল,

"বাবু জী, জীবিত কালে মানুষকে ধনী ও গরীব করিয়া সাজাইয়াছেন, গরীবকে সর্ব্বদা দূরে রাখিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। মৃতদেরও কি জাতিভেদ রাখিবেন না কি? মরিয়াও কি তারা আপনাদের দয়া পাইবে না?"

নরেন লজ্জা পাইয়া বলিল, "না, না, না।"

"শুনিয়া সুখী হইলাম। লজ্জা করিবেন না. আরও কাছে আসিয়া বসুন। আপনাকে এই কবরটার সম্বন্ধে সকল কাহিনী বলিব।" এই বলিয়া সে সেই শীতল পাষাণের উপর আপনার চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল। তখন দেখা গেল, সে নিবিড় স্নেহে এক হাতে সেই ছোট কবর-টাকে বেষ্টন করিয়া আছে।

"বাবু জী পান খান কি?"

"খাই।"

"পান লইবেন?"

"দাও।"

"বাবু জী, পৃথিবীতে আমার দুইটি প্রিয় বস্তু ছিল, এক প্রিয়তমা আর পান। প্রিয়তমা আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, পান রহিয়াছে। যত দিন থাকিব পান খাইয়া মধ্যে মধ্যে মুখ লাল করিতে হইবে বৈ কি। হায়! আজ যদি সে বাঁচিয়া থাকিত!

"অবজ্ঞা করিবেন না বাবু জী। গরীবের মেয়ে, গরীব সে। কিন্তু হৃদয়-খানা রাজরাণীর মত ছিল। কিন্তু অহো দুর্ভাগ্য! সে হৃদয়ের পরিচয় কি আমি আগে বুঝিয়াছিলাম? আপনার আর দোষ কি।"

"তোমার কাহিনী বল।"

"এই যে বলি। বাবু জী, ধন বলুন, যশ বলুন, সাম্রাজ্য বলুন, যা বলুন, আজ যে এই পাথরের ভিতরে শুইয়া ঘুমাইতেছে, তার কাছে কিছু নয়। তার জন্য সমস্ত তুচ্ছ করিতে পারা যায়। সে যদি আজ বাঁচিয়া উঠিয়া নাম ধরিয়া ডাকে, পরীক্ষা করে, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, আমি রাজ্য চাহিব না। শুধু নিজের ধর্ম্মটা দিতে পারিব না, আর সব পারিব।

"এই কঠিন শীতল পাষাণ যাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাকে চোখে দেখেন নাই! ভালই করিয়াছেন। তাকে যে চোখে দেখিয়াছে, সেই পাগল হইয়া গিয়াছে। আমিও হইয়াছিলাম। সে যেন বিদ্যুৎ। আমি শুধু ভাবি, তার রূপ তাকে কেন পাগল করে নাই।"

নরেন তার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া বলিল, "তুমিও ত দেখিতে মন্দ নও।"

"অনেক সেলাম বাবু জী। কিন্তু পুরুষের রূপের সঙ্গে কখনো নারীর রূপের তুলনা করিতে যাইবেন না, ঠকিবেন। আমার বিশ্বাস, পুরুষ সাধারণতঃ নারী হইতে অনেক বেশী সুন্দর। কিন্তু এক একজন নারী আছে, তার সৌন্দর্য্যের কাছে সব চেয়ে রূপবান্ পুরুষের রূপও ম্লান হইয়া যায়।"

"সত্য বটে, ভালবাসার পাত্রী প্রত্যেকের কাছেই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর, ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

"না বাবু জী, অন্যায় করিবেন না। এই চোখে পরীর মত হাজার হাজার সুন্দর নারী দেখিয়াছি। তার কাছে কেহ দাঁড়াইতে পারে না, এ আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। গঙ্গা—"

"গঙ্গা কে?"

"আমার প্রিয়তমা, যে এখানে শুইয়া আছে।"

নরেন মনে মনে চটিয়া লাল। ব্যস্ত হইয়া বলিল :

"কি বলিতেছ ?"

"আমার কাহিনী।"

"তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে।"

"না।"

"গঙ্গাকে তুমি চিন না।"

"গঙ্গা আমার প্রিয়তমা।"

"সাবধান ! গঙ্গা হিন্দু-কন্যা।"

"হিন্দু-কন্যা। তাই কি ?"

নরেন ঘোরতর আপত্তি করিয়া উঠিল, "হিন্দুর মেয়েকে কেহ কোনদিন কবর দিতে পারে না। তুমি মিথ্যা বলিতেছ।"

মুসলমান যুবক মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "মহাশয় ! গল্পটা আগে শেষ অবধি শুনুন, আপনার উত্তর পাইবেন। গঙ্গা শুধু হিন্দুর মেয়ে নয়,—ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

নরেন কোন মতে রাগ চাপিয়া বলিল, "আচ্ছা বল।"

যুবক অত্যন্ত স্নেহ-মাখা সুরে বলিল, "ধর্ম্ম আমি ছাড়িতে পারি না, ধর্ম্ম আমার প্রাণ। কিন্তু তবু আমি গঙ্গাকে প্রাণের চেয়ে কম ভালবাসিতাম না। এমন কি, স্বীকার করিতেছি, মনে এক সময়ে দ্বন্দ্ব পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল—ধর্ম্ম রাখিব না ভালবাসা রাখিব ? আল্লার কৃপায় ধর্ম্মত্যাগ করিতে হয় নাই।

"এক বিষয়ে আমি বিশেষ ভাগ্যবান্ ছিলাম। যদিও আমি মুসলমান এবং যদিও শত শত লোক গঙ্গাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, তবু তার কাছে আমি সব চেয়ে বেশী প্রশ্রয় পাইয়াছি। এমন কি, তার

ভালবাসা পাইয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্য, তবু আমার মন ভরিত না। আমার মনের মধ্যে গুপ্ত আশঙ্কা একটা যেন ছিল।

আমি একদিন স্পষ্টই তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বিবাহ করিবে?'

" 'কাহাকে?'

" 'আমাকে।'

" 'না।'

" 'না কেন?'

" 'তুমি মুসলমান।'

" 'তুমিও মুসলমান হও না?'

" 'না। তুমি হিন্দু হও না?'

" 'আমি হিন্দু হইব?'

" দোষ কি?'

" 'হায়!'

" 'এ কাজ অনেকে করিয়াছে।'

" 'আমি করিব না।'

" 'কেন করিবে না?'

" 'করিব না।'

" 'ধর্ম্মই কি তোমার কাছে বড় হইল, আমি কিছুই নই?'

" 'হায়!'

" বাবু জী, উল্টাইয়া আমারও প্রশ্ন করিবার ছিল, শত শত নারী ত তাদের প্রিয়তমের জন্য ইহার পূর্ব্বে আপনার সর্ব্বস্ব দিয়াছে, সে কেন তার ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না? কিন্তু প্রশ্ন করি নাই। ব্রাহ্মণের মেয়ে! চিরকাল সংযত হইয়া কাটাইয়াছে। জানিতাম, তর্ক দিয়া

ইহাকে অভিভূত করিতে পারিব না। জানিতাম, আমি হিন্দু হইয়া গেলেই ব্রাহ্মণ-কন্যাকে লাভ করিতে পারিতাম না।

"মরিলেও আমি হিন্দু হইতাম না, সেও মুসলমান হইত না। সেটা সত্য কথা। এবং এই সত্য কথা আমাদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। আমার হৃদয়ের কোন দুঃখ, কোন অভিশাপ এই ব্যবধানকে দূর করিবার ক্ষমতা রাখিত না।

"দুঃখের কথা বলিলাম। বাবু জী, এ দুঃখের কথা বুঝিবেন কি? আপনার দেখিতেছি এখনো বেশী বয়স হয় নাই। আপনি বুঝিলে বুঝিতে পারেন,—যুবা-বয়সে প্রিয়তমাকে না পাইলে কেমন করিয়া বুক ফাটিতে থাকে, কেমন করিয়া জীবনের সমস্ত কাজ বিস্বাদ হইয়া যায়।

"আমারও তাই হইল। দিনে দিনে পলে পলে আমি মরিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়! তখন যদি জানিতাম আমার প্রিয়া আমারও আগে চলিয়া যাইবে, তবে আমিই কি বাঁচিয়া থাকিতে চাহিতাম? প্রিয়ার জন্য আমি বাঁচিতে চাহিয়াছিলাম।"

নরেন সহানুভূতির সহিত বলিল, "সে কিসে মরিয়াছে?"

"মরিয়াছে।"

"জিজ্ঞাসা করিতেছি কি হইয়াছিল?"

"কিছু হইয়াছিল।"

"কি? প্রেম-জ্বর!"

"না।"

নরেন ভাবিয়াছিল, অন্তত আশা করিয়াছিল, একটু উপন্যাসের সন্ধান পাইয়াছে। এটায় একটু নূতনত্ব আছে বটে। মুসলমান যুবকের প্রেমে পড়িয়া এ পর্য্যন্ত কোন হিন্দু-নারী অসহ্য বিরহ-দুঃখে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আর শোনা যায় নাই।

কিন্তু যুবক বলিল, না। সব মাটি হইয়া গেল। হাজার হউক মুসলমান ত! উহারা উপন্যাসের কি ধার ধারে? একটু ক্ষুব্ধচিত্তে বলিল, "তবে?"

"রোগ হইয়াছিল।"

"কি রোগ?"

"বলিব। কলেরা।"

তারপর নদীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, "বাবু জী, গঙ্গার প্রেমে মজিয়া আমার পরকালের কি হইয়াছে জানি না, কিন্তু ইহকালের সমস্ত সুখ ও স্বচ্ছন্দতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

"আমি এমন কিছু বুদ্ধিহীন ও বিদ্যাহীন ছিলাম না। ইচ্ছা করিলে মাথা খাটাইয়া দু পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিতাম, চাই কি, বড় লোক হইতে পারিতাম। তখন আমার প্রিয়ার কবরের এই রকম দুর্দ্দশা আপনাকে হয় ত দেখিতে হইত না। সকলের আগে ইহাই আপনার চোখে পড়িত।

"তা হইল না। আমি কোন কাজে মন দিতে পারিতাম না। তাকে ভালবাসিতাম আর ভালবাসিতাম। তার কথা ভাবিতাম, তাকে লইয়া কবিত্ব করিতাম। কবিত্ব করিয়া পেট ভরে না। আমারও আজ দু বেলা আহার জোটে না।"

"তবু পান খাওয়া চাই!"

"বলিয়াছি ত, পান না হইলে আমার চলে না।"

"এই লও চারি আনা পয়সা। তোমায় দিলাম।"

"সেলাম বাবু জী, আপনার এই চারি আনা গ্রহণ করিলাম, আল্লা আপনার মঙ্গল করিবেন। আমি জানি, এই রকম দান-গ্রহণ উচিত নহে। ইহাতে আত্মাকে ছোট করা হয়। কিন্তু আপনি ভালবাসিয়া দিলেন, তাই লইলাম।"

"তোমার গল্পটা বলিয়া ফেল। বড় দেরী করিতেছ।"

"বাবুজী, এ যে আমার ভগ্ন-হৃদয়ের ইতিহাস, দেরী ত হইবেই। আপনার কি ভাল লাগিতেছে না?"

"লাগিতেছে, তুমি বল।"

"আজ যেমন ঐ কথা আপনাকে বলিলাম, ঐ রকম কত বার না গঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, 'গঙ্গা, তুমি কি আমাকে ভালবাস না?'

" 'বাসি।'

" 'সত্য করিয়া বল।'

" 'সত্য বলিতেছি।'

" 'আমি মুসলমান।'

" 'তাতে বাধা কি?'

" 'ভাল বাসিতে বাধা নাই, বিবাহে বাধা আছে!'

" 'আছে।'

" 'সে বাধা মানিবে?'

" 'মানিব।'

" 'তুমি যদি মুসলমানের ঘরে জন্ম লইতে, কি সুন্দর হইত!'

" 'হিন্দুর ঘরে তোমার জন্ম আরো সুন্দর হইত। কিন্তু সে কথা ভাবিয়া লাভ কি?'

'লাভ নাই।'

"গঙ্গা আমাকে সত্য ভালবাসিত, জানিতাম। কিন্তু ঠিক বলা হইল না। নিজের মনের ধ্রুব-বিশ্বাস কষ্টকর নহে। কিন্তু আজ যেমন আপনাকে একটু আগে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাল লাগিতেছে না কি?—তখন তেমন সর্ব্বদাই নিজেকে ঐ প্রশ্ন করিতাম। মনে হইত, এই বুঝি গঙ্গার আর আমাকে ভাল লাগিবে না, এই বুঝি আমার উপর তার

ভালবাসা ফুরাইয়া গেল! বাবু জী, সে যে কি কষ্টকর, আমি আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। গঙ্গা আর কাহাকেও আমার চেয়ে প্রীতির চক্ষে দেখিবে ইহার কল্পনা মাত্র আমাকে ব্যথিত করিত। প্রতিক্ষণ মনে হইত, গঙ্গার আমাকে ভাল লাগিতেছে না।

"তারপর আমার এই কষ্ট আরো বাড়িবার কারণ আসিয়া উপস্থিত হইল। শুনিলাম, একটি হিন্দুর ছেলে, ব্রাহ্মণ, গঙ্গাকে না কি ভালবাসিয়া পাইবার লোভ করিয়াছে। তাকে না কি গঙ্গার বাপমায়েরও মনে ধরিয়াছে।

"হায়, আমার সাধের আশা!

"সেই দিন হইতে আমার শয্যা-কণ্টক আরম্ভ হইল। আমার চারিদিকের বাতাস বিষাক্ত হইয়া গেল। আমি সর্ব্বত্র বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। গঙ্গাকে কোন দিন আমার আপনার করিবার কোন উপায় নাই। আমি তাকে পাইব না।

"কিন্তু অন্যে তাকে কেন পাইবে? যে ভালবাসা আমি তাকে নিবেদন করিয়া সার্থক হইতে চাই, অন্যে কেন তার সুযোগ পাইবে? আমার সহ্য হইল না।

"তখন হইতে আমি অনেক বার করিয়া গঙ্গার মুখের দিকে তাকাইতাম। তার মুখের ভিতর দিয়া তার হৃদয়খানি পড়িতে চাহিতাম। সে হাসিয়া কহিত 'কি দেখিতেছ?'

" 'তোমার মুখ।'

" 'কিসের জন্য?'

" 'তোমার হৃদয় বুঝিতে।'

" 'সে কি জান না?'

" 'জানি।'

" 'অবিশ্বাস আসিয়াছে?'

" 'না।'

"কিন্তু শেষে সত্য সত্যই জীবনে সেই ভয়ঙ্কর দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ছেলেটির সঙ্গে গঙ্গার বিবাহ স্থির হইল। গঙ্গা বলিল, 'আমার বিবাহ হইবে।'

" 'এত দিন কি আমার সঙ্গে খেলা করিয়াছ?'

" 'না।'

" 'সত্য ভালবাসিয়াছ?'

" 'বাসিয়াছি।'

" 'তবে বিবাহ কেন করিবে?'

" 'বিবাহ ধর্ম্ম।'

" 'স্বামীকে ভালবাসিতে পারিবে?'

" 'চেষ্টা করিব।'

" 'আর আমি।'

" 'তুমি কি?'

" 'আমি।'

" 'ওঃ, তোমাকে ভালবাসিয়াছি?'

" 'হাঁ।'

" 'ভালবাসা অপরাধ নহে। তোমাকে ভুলিব।'

" 'ইহাই হিন্দুর মেয়ের উপযুক্ত কথা বটে!'

নরেন বলে মুসলমানটির এই কথায় যে তার কি আনন্দ হইয়াছিল বলা যায় না। "গঙ্গা ত ঠিক করেছে। সে না কি যাবে মুসলমানকে ভালবাস্‌তে! আমার মনে হল সে এত দিন তাকে নিয়ে খেল্‌ছিল। যেই শুন্‌লাম গঙ্গা বিয়ে করে সুখী হতে পারবে বল্‌ছে, তখনি মুসলমান

যুবকটির উপর একটু করুণা হল। আঃ, সে সময় তোমরা যদি তার চোখ দেখ্‌তে! ধারাল ছুরির মত চক্‌ চক্‌ করছে।”

এমন সময় জ্যোৎস্না মিলাইয়া গেল, আকাশ অন্ধকার হইল, বাঁশ-ঝাড়ের শব্দ বাতাসে তীব্র হইয়া উঠিল, সে স্থান প্রেত-ভূমির মত লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই লাল টুপি পরা যুবক নতজানু হইয়া তিন বার বুকভাঙ্গা স্বরে “আল্লা, আল্লা, আল্লা” করিয়া উঠিল আর তার গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বাহির হইল, ‘অহহ।’

নরেন ব্যস্ত হইয়া বলিল, “কি হইয়াছে?”

“কিছু নয়। বুকের এইখানটায় কে যেন হাতুড়ির ঘা মারিয়া গেল। যখনি আমার প্রিয়ার মৃত্যুর কথা মনে হয়, তখনি এইরূপ হয়।”

“কেন?”

“সেই কথাই ত বলিতে যাইতেছি। গঙ্গা মরিল, সেইটাই কাহিনীর মধ্যে সব চেয়ে করুণ। আমি জানি, সে আমার দোষে মরিয়াছে। আমি তাকে মারিয়াছি। স্বর্গেও আমি সান্ত্বনা পাইব না।

“যখন স্থির জানিলাম, গঙ্গা আর একজনের হইবে, আমার হইবে না, তখন সমস্ত বুক জ্বলিয়া গেল। বাবু জী, আমার ভিতরে মুসলমানের রক্ত, গায়েও যথেষ্ট বল আছে,—পরীক্ষা করিয়া দেখুন। আমি ইচ্ছা করিলে সেই হিন্দুর পুত্রকে কি মারিয়া ফেলিতে পারিতাম না? নিশ্চয় পারিতাম। কিন্তু তবু আমি তাকে মারিলাম না।

“আমি কি করিলাম জানেন? আল্লার নিকট প্রার্থনা, শুধু প্রার্থনা। সে কি ভীষণ প্রার্থনা! দিন নাই, রাত নাই, আমি সমস্ত অন্তর দিয়া, সমস্ত শক্তির সহিত বলিতে লাগিলাম, ‘হে আল্লা, হে কৃপাময়, তুমি দয়া কর, তুমি গঙ্গাকে মারিয়া ফেল, তুমি গঙ্গাকে মারিয়া ফেল, যেন সে অন্যের স্ত্রী হইতে না পারে, সে অন্যের ভালবাসা না পায়। সে আমার।

"বাবু জী, হাসিবেন না, ইহা সত্য কথা। আমি প্রাণপণে গঙ্গার মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, গঙ্গা মরিলে সব জুড়াইবে। গঙ্গাকে কিছুতেই আর কারো হইতে দিব না।

"আল্লা কি পাগলের কথা শোনেন? জানি না। কিন্তু আমার কথা শুনিলেন, বড় ভীষণ শোধ তুলিলেন। গ্রামে কলেরা দেখা দিল। প্রতিদিন দলে দলে লোক মরিতে লাগিল, গৃহ শূন্য হইয়া গেল। অনেক মানুষ পলাইয়া গেল। সেই মড়কে গঙ্গার মা মরিল, বাপ মরিল, আত্মীয়-স্বজন সব মরিল, সেই ছেলেটিও মরিল। বাকী রহিল শুধু গঙ্গা।

"আমার যে তখন আনন্দ! মরণের তীরে দাঁড়াইয়া গঙ্গা আমাকে পরম নির্ভরে, পরম ভালবাসায় জড়াইয়া ধরিল। তার যে আর কেহ নাই। সেই কটা দিন আমার স্বর্গসুখ গিয়াছে।

"কিন্তু সুখ স্থায়ী হইল না। আমরা পলাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই গঙ্গা কলেরা হইয়া মরিল। প্রিয়ার মুখে শেষ চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিলাম।

"তখন মনে হইল, গঙ্গার মৃত্যু আমি কামনা করিয়াছিলাম। গঙ্গা মরিল। কিন্তু হৃদয় জুড়াইল কৈ? গঙ্গা আর কারো হইতে পারে নাই। কিন্তু তবু এত জ্বালা কেন? মনে হয়, আমার গঙ্গাকে আমি মারিয়াছি,—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

"বাবু জী, গঙ্গা হিন্দুর কন্যা, জানি। কিন্তু তবু আমি তাকে এইখানে আনিয়া সাধ্যমত যত্নে কবর দিয়াছি। বাঁচিয়া থাকিতে সে ত মুসলমান হয় নাই। মরিয়া সে আমার ধর্ম্মে এবং প্রাণে মিশিয়া গিয়াছে। আমার অনন্ত কালরাত্রির মধ্যে এই একটু সান্ত্বনা।"

"হিন্দুর মেয়েকে কবর দিয়া অন্যায় করিয়াছ।"

"আমার হৃদয়ের দিকে চাহিয়াও কি সে অন্যায়ের ক্ষমা হইতে পারে

না, বাবু জী ? এই কবরটি ছাড়া পৃথিবীতে আর যে আমার কিছুই নাই, ইহাকে লইয়া বাঁচিয়া আছি। হায় গঙ্গা ! গঙ্গা !"

নদীর বুকে সর্ সর্ শব্দ হইল, তারপর বৃষ্টি নামিল। এত ক্ষণে নরেনের চৈতন্ত হইল যে ফিরিতে হইবে। সেই যুবক বলিল, "বাবু জী, বৃষ্টি পড়িতেছে।"

"হাঁ।"

"উঠা যাক্। আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তবে আজ রাত্রিটা আমার ওখানে কাটাইয়া গেলে হয় না ?"

"আমার আপত্তি নাই।"

মুসলমান যুবক তখন তাকে আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। তারপর কখন যে সে অদৃশ্য হইয়া গেল, নরেন বুঝিতেও পারিল না। সে চাহিয়া দেখে বাঁশপুর ছাড়াইয়া আসিয়াছে।

নরেন বলে, দোষ তার। সে এতখানি অন্তমনস্ক ছিল যে, তাকে ধরিতে পারে নাই বা ভুল পথে গিয়াছিল। তারপর অবশ্য সে অনেক খুঁজিয়াছিল, কিন্তু পায় নাই।

বন্ধুরা অবশ্য তার কথা বিশ্বাস করিতে চায় না। তারা অন্য প্রকার সন্দেহ করে।

'কি সন্দেহ ?'

'ভূতের দৌরাত্ম্য।'

নরেন আজ এক মাস সকলের সঙ্গে কথা বন্ধ রাখিয়াছে এবং আমরা তার বন্ধুরা বাজী রাখিয়াছি, যে তাকে প্রথম কথা বলাইতে পারিবে, তাকে চাঁদা করিয়া ১০০৲ টাকা পুরস্কার দিব।

ভাদ্র, ১৩৩১।

মা ও ছেলে

ছেলে বিদেশে পড়ে !

কি পড়ে মা অতশত বুঝেন না। অনেক পড়ে, এই মাত্র জানেন। আর তাহা লইয়া পাড়াপড়সীর নিকট গর্ব্ব করেন। চিঠি আসিলে একবার ভাঁজ করেন, একবার খোলেন, এবং দিবসের সমস্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনেক বার ঐ অচেনা অক্ষরগুলার দিকে তাকাইয়া থাকেন। বেড়াইতে যাইবার সময় চিঠিগুলি সঙ্গে লইতে কখনো ভোলেন না এবং যাহাকে সাম্‌নে পান তাহাকেই ধরিয়া বলেন, "আমার খোকা চিঠি লিখেচে ! দেখেচ দিদি···"

খোকা নেহাৎ ছোট নয়। বিশ বাইশ বছর ছাড়াইয়া গিয়াছে। পাশও কতকগুলা করিয়াছে।

মা জানেন তাঁর ছেলের মত ছেলে জগতে আর হয় না। এত বুদ্ধি, এত মাথা আর কারো থাকিতে পারে না।

কিন্তু অন্য লোকেরা, বিশেষত পুত্রের মাতারা, নির্ব্বোধ। তাহারা এ কথা মানিতে চায় না !

বিনোদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিলে তাহারাও স্ব স্ব পুত্রের গুণপণা বিবৃত করিয়া কহে। তাদের ছেলেরাই বা কম কিসে ? কম যে নয়, তাই দৃষ্টান্ত সহ প্রমাণ করে। এ সকলের উত্তরে কিছু বলা চলে না। মা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শোনেন এবং অপ্রসন্ন মনে মাথা নাড়িতে নাড়িতে ভাবেন, আমার ছেলের মত কিছুতেই হতে হয় না !

বিনোদ ছেলেটি বাস্তবিকই বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্, কিন্তু তার মা যতটা ভাবেন ততটা নহে। মার বাড়াবাড়িতে সে সময় সময় অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াও হাসিয়া ফেলে, "কি যে বল মা?"

ছেলের ধমকে মা প্রথমটা থম্‌কিয়া যান। কিন্তু তার হাসি দেখিয়া বলিয়া উঠেন, "তুই থাম্ ত। আমি যা জানি, তাই-ই বলি,"—এবং তারপর দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে তাহার গুণ-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন।

ছেলে বলে "মান্‌লুম মা, আমি তোমার অশেষ গুণধর পুত্র। কিন্তু ছেলের সাম্‌নে ছেলের অমন প্রশংসা কর্‌তে আছে বুঝি! তা হ'লে যে আমার অহংকার হবে।"

মা বলেন, "তুই আমাকে রাগাস্ কেন?"

সুতরাং বেশীর ভাগই তাহাকে সে সমস্ত কথা হজম করিতে হয়।

•

বিনোদ বাড়ী আসিলে পাড়ার যারা বেড়াইতে আসিয়া তাকে দেখে তারা বিনোদের মাকে বলে, "বিনোদের মা, তোমার ছেলের বিয়ে দাও নি এখনো গো?"

মা একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলেন, "না ভাই। ছেলে এখন পড়্‌ছে কি না, তাই বিয়ের মত হয় না। বলে, পড়া শেষ হোক্ এখন, তারপর বিয়ে কর্‌ব।…"

"ওমা! এত বড়টি হয়েছে, পাশ-পোশও ত অনেক করেছে, বিয়ে না দিলে এখন আর মানায় কৈ?"

ছেলের 'এত বড় হওয়া'র কথা শুনিয়া মা মনে মনে চটিয়া উত্তর করেন, "তা করুক্ গে যা ওদের ইচ্ছা। আজকালকার ছেলে। মেয়ে

নিজে না বেছে কি আর বিয়ে কর্‌বে?" শেষের দিকে তাঁহার স্বর কোমল হইয়া আসে।

হিতৈষিণীরা বলেন, "বিনোদের মা, আর দেরী কোরো না ভাই, এই বেলা ছেলের বিয়ে দিয়ে দাও। ছেলে উড়্‌তে শিখেছে, কোন্ দিন উড়ে পালাবে। একটা বউ এনে দিলে, তাই নিয়েই বাড়ীতে বসে খেল্‌বে এখন।"

ছেলে যদি বাড়ীতে থাকে আর এ সব কথা শুনিতে পায়, তবে সে কথা সে সাম্‌নের ঘর হইতে কাসিয়া জানাইয়া দেয়। মাতা তাহাতে অকারণে চটিয়া উঠেন।

এ কথা সত্য, গরমের বন্ধই হোক্ আর পূজার বন্ধই হোক্, প্রত্যেক ছুটিতেই মা পুত্রের জন্য এক একটি কনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেক বারেই তাহাকে নানা কথায় ভুলাইয়া পরে বলিয়াছেন, "এ মেয়েটি আমার ভারী মনে ধরেছে বিনোদ! বড় লক্ষ্মী মেয়ে···" ইত্যাদি।

বিনোদ এক একবার হাসিয়া বলিয়াছে, "মা, তোমার কথামত বিয়ে কর্‌লে এত দিনে আমার কটা বিয়ে হত বল ত?"

মা বলিতেন, "যা যা তোর আর জ্যাঠামো কর্‌তে হবে না।"

বিনোদ তেমনি ভাবে বলিত, "জ্যাঠামো নয়, সব গুলিকেই ত তোমার মনে ধরেছে। এখন কোন্‌টিকে ছেড়ে কোন্‌টি নিতে আমায় বল দেখি।"

মা একটু নরম হইয়া বলিতেন, "তুই ত কোনটিই নিতে দিলি না।"

"কাজেই।···তোমার যখন আর বাজার বাছাই হয় না, আমাকে সব

গুলিই ফেরৎ দিতে হল। পাড়আলা কাপড় আর আমার পছন্দ হয় না মা, আমি এবার গেরুয়া পর্‌ব। গেরুয়ার সুবিধা এই যে গেরুয়া খুব কম লোকে কেনে।”

ইহা সন্ন্যাসের কথা নহে, বিধবা-বিবাহের কথা। মা সে কথা বুঝিতেন। আর তখনি চম্পট দিতেন। কারণ এ কথা তিনি ভাল জানিতেন যে, তাঁহার ছেলের সঙ্গে তিনি তর্কে কিছুতেই আঁটিতে পারিবেন না।

এমনি করিয়া প্রতি বারেই বিনোদ বিবাহটার সঙ্গে লুকাচুরি খেলিয়া আসিয়াছে।

সময় সময় মা অনুযোগ করিয়া বলিয়াছেন, “দেখ্ বিনোদ, তুই ত বিয়ে কর্‌তে চাস্ না, কিন্তু লোকে যে আমায়ই দুষ্‌তে আরম্ভ করেছে।”

বিনোদ আশ্চর্য্য হইবার ভাণ করিয়া বলে, “কেন?”

“কেন আবার? সবাই ভাবে, বিয়ে কর্‌লে ছেলে পর হয়ে যাবে, সেই ভয়ে মাগী ছেলের বিয়ে দেয় না।”

বিনোদ কষ্টে হাসি দমন করিয়া বলে, “তা ভাবুক না।”

এই উত্তরে বিস্মিত মাতা পুত্রের মুখের দিকে তাকাইবা মাত্র সে হো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে। মা প্রীত ও ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া যান।

কিন্তু—

বড়দিন প্রভৃতি যে সমস্ত বন্ধ কলেজের বড় বড় ছুটির মাঝে পাওয়া যায়, যাহারা এত বড় নহে যে বাড়ী গিয়া উপভোগ করা যাইতে পারে, অথচ এত ছোটও নয় যে যেখানে ছিলাম সেখানে থাকিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারি,—সেই সব বন্ধে বিনোদ মাঝে মাঝে অদূরবর্ত্তী কোন কোন জায়গায় যাইত, যেমন চন্দননগর, বর্দ্ধমান, কাচরাপাড়া, ইত্যাদি। এ সকল জায়গা যে তাহার পরিচিত ছিল কিংবা কোন আত্মীয়ের বাসস্থান ছিল তাহা নহে। তাহার মনের মধ্যে সতত ভ্রমণশীল যে

একটা ইচ্ছা বাস করিত, তাহারি চরিতার্থতার জন্য সে কলিকাতা ছাড়িয়া নব পরিচয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিত। সে নতুন লোক, নতুন জীবনযাত্রার প্রণালী ও নব নব দৃশ্য দেখিতে ভালবাসিত। তাহারাই তাহাকে ঐ বিপুল পৃথিবীর একটুখানি রহস্যকে, অজানাকে, আবিষ্কার করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া তুলিত। অবশ্য যে সব জায়গায় সে যাইত, সে সব জায়গায় তাহার কলিকাতার জীবনের নব-পরিচিতদের মধ্যে কেহ না কেহ থাকিত। তাহারাই তাহাকে সাদরে নিজ গৃহে আমন্ত্রণ জানাইত। এবং সে আমন্ত্রণ কোন আত্মীয়ের আমন্ত্রণ অপেক্ষাই কম অতিথিবৎসল ছিল না।

কোনখানে যাইবার আগে, বিনোদ মাকে চিঠি লিখিত, "মা, আমার কয়েক দিন ছুটি আছে। এ ক'দিন কল্‌কাতায় মন টিক্‌চে না। অমুক জায়গায় আমার পরিচিত এক বন্ধু আছে—সে আমার সঙ্গে পড়ে। আমি সেখানে চল্লুম, তাদের বাসায় থাক্‌ব।"

অথবা লিখিত, "অমুক আমায় এই ছোট বন্ধে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েচে। ও জায়গাটা দেখ্‌বার আমার ভারী ইচ্ছা ছিল, আর দূরও ত বেশী নয়, আমি আজকের গাড়ীতেই চল্লুম," ইত্যাদি।

মার মুখ গম্ভীর হইয়া যাইত। চিঠি পড়িয়া শুনাইতেন অবশ্য বিনোদের বাপ। গৃহিণীর মুখের ভাব-বদল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "ও কি, অমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?"

গৃহিণী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিতেন, "ও কিছু না," কিন্তু তাঁর মুখে চিন্তার লক্ষণ স্পষ্ট ধরা পড়িত।

ব্যাপারখানা কি কর্ত্তা আগেই বুঝিতে পারিতেন, কারণ এমন ঘটনা অনেক ঘটিয়া গিয়াছে। তাই তাঁহাকে রাগাইবার জন্য বলিতেন, "দেখ্‌চ কি, এই বার ছেলে পর হয়ে গেল।"

গৃহিণী বলিতেন, "ঈস্!"

কর্ত্তা বলিতেন, "ঈস্ নয়। তুমি কি মনে কর তোমার ছেলেকে তারা অম্নি অম্নি নিজের বাড়ী নিয়ে গেছে? নিশ্চয় তাদের ঘরে বিয়ের মেয়ে আছে, তাই ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মন ভোলাতে।"

কর্ত্তা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেন।

কিন্তু গৃহিণী এ হাসির কিছুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়া বলিতেন, "আমার ছেলে তেম্নি কি না, যার তার ঘরে গিয়ে মেয়ে দেখে ভুল্বে!"

বলিতেন বটে, কিন্তু মনে মনে আশ্বস্ত হইতে পারিতেন না। অনেক ক্ষণ উঠ্‌বস্ উঠ্‌বস্ করিয়া বিনোদের বাপের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিতেন, "তুমি আমার নামে তার কাছে একখানা চিঠি লেখ ত।"

নিতান্ত বাধ্য ভৃত্যের মত কর্ত্তা দোয়াত কলম লইয়া আসিয়া বলিতেন, "কি লিখ্‌ব?"

"লেখ"—বলিয়া ভাবিতে বসিতেন। অনেক ক্ষণ ভাবিয়া বলিতেন, "জিজ্ঞাসা করে পাঠাও, সে যে বাড়ীতে গেছে তারা কেমন লোক..."

"আর?"

"তারা যত্ন কর্‌ছে কি না..."

"তাকে ডেকে নিলে, আর যত্ন কর্‌বে না? বিশেষ, তাকে যদি জামাই কর্‌বার মৎলব করে থাকে?"

"কি যা তা বক্‌চ?"

"আচ্ছা, আর বক্‌ব না। কিন্তু আর কি লিখ্‌ব?"

"জিজ্ঞাসা কর, তারা কেমন অবস্থার লোক।"

"আর?"

"যে ছেলেটির কাছে গেছে তারা ক'ভাই...আর...আর..."

" কি ?"

" ···ক'বোন ?"

কলম ফেলিয়া কর্ত্তা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

" এত হাস্‌চ যে! কেন, তাতে দোষটা কি ?"

" দোষ কিছুই নয়।"

" তবে ?"

" অত ভূমিকা কর্‌বার কি দরকার ছিল ? সোজাসুজি বল্লেই হত, বাপু হে, তোমরা কি মৎলবে আমার ছেলেটিকে পাক্‌ড়াও করে নিয়ে গেছ ? মেয়ে টেয়ে আছে বুঝি ?"

" আমি বুঝি তাই বল্লুম ?"

" কিন্তু যা লিখ্‌তে বল্‌চ, তাতে ঐ হয়।"

" তোমার যত সব বাড়াবাড়ি। নাও, লেখ।"

" যথাজ্ঞা।"—কর্ত্তা লিখিয়া ফেলিলেন। শেষে বলিলেন, " এ পত্র যখন পুত্ররত্নের হাতে পৌছাবে তখন সে কি ভাব্‌বে বল দেখি।"

" সে একটুও বুঝ্‌তে পার্‌বে না।"

" না, তা কি আর পার্‌বে ? সে এম্‌নি এম্‌নিই এত লেখা-পড়া শিখেচে! সে পড়্‌বে আর হেসে ভাব্‌বে, মা আমাকে সন্দেহ কর্‌চে।"

" তা ভাবুক।"

" কিন্তু এ দিকে ত সে বাড়ী আস্‌তে না আস্‌তেই তার বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে যাও—"

"আমি নিজে কনে দেখে বাছা এক, আর—"

" আর সে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করা আর, নয় ? তা ত নিশ্চয়ই। আর ছেলে বড় হয়েছে, সে যদি বিয়ে করে, তার পছন্দমতই ত বিয়ে করা উচিত।"

" সে তেমন ছেলে নয় গো, যাকে এনে বল্‌ব বিয়ে কর্‌ তাকেই সে বিয়ে কর্‌বে।"

" আচ্ছা, দেখা যাবে।"

মার চিঠি পাইয়া বিনোদের হাসি আসে, একটু দুঃখিতও হয় এই ভাবিয়া যে, "মা আমাকে এখনো উঠ্‌তে বস্‌তে চোখে চোখে রাখে।" সে বুঝিতে পারে না যে, মার অন্ধ স্নেহ ভীত হইয়াই অনেক সময় তাহার স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে চাহে।

মার ইচ্ছা বিনোদ বিবাহ করুক, বউ লইয়া সুখে ঘর-কন্না করিতে থাক্‌, দেখিয়া তাঁহার চোখ জুড়াইবে। মার ভয়, বিবাহ করিলে মার চেয়ে বউই বিনোদের বেশী আপন হইয়া যাইবে। যে ছেলেকে তিনি এত কাল মানুষ করিলেন, তাকে যদি একটা অপরিচিত মেয়ে দু দিনে জয় করিয়া লইয়া যায়, তবে সে পরাজয় তিনি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন?

বিনোদের বিবাহ একদিন নিশ্চয় হইবে। কিন্তু যত দিন না হয়, তত দিন তাঁহার হৃদয় এমন করিয়া একবার চাহিবে আপনার কথা ভুলিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে, আর বার চাহিবে নারীত্বের সব চেয়ে বড় কথা মাতৃত্ব, স্ত্রীত্ব নয়,—এই কথা প্রমাণ করিতে।

বৈশাখ, ১৩২৮।

পিতৃঋণ

বাংলা দেশের কোন এক গ্রামে কালীচরণ দত্ত ও পরমেশ্বরপ্রসাদ সিংহ নামে দুই বালক বাস করিত। ছেলে বেলা হইতে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। ইহারা উভয়ে যখন গ্রামের স্কুলের প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিল, তখন সেই গ্রামে নূতন এক ঘটনা ঘটিল। রমেশ বসু নামক এক ব্যক্তি আসিয়া জমি লইলেন এবং হঠাৎ এক তিনতলা বাড়ী গড়িতে লাগিয়া গেলেন।

এই রমেশ বসু অবশ্য গ্রামের লোক। কিন্তু তিনি এত দিন কোথায় ছিলেন, কি করিতেন, কত টাকা জমাইয়াছেন,—এ সব কথার চেষ্টা করিয়াও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁর সম্বন্ধে আলোচনায় সমস্ত গ্রাম গরম হইয়া উঠিল। 'রমেশ বসু দালান বানাইতেছে,'—সকলের মুখে এই কথা।

তখন তিনতলা বাড়ীর অনেকখানি শেষ হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় একদিন বিকাল বেলায় কালীচরণ ও পরমেশ্বর অস্থির ভাবে নদীর তীরে পদচারণা করিতেছিল। এক একবার থামিয়া তারা উদাস-নয়নে নদীর দিকে চাহিতেছিল, পাল-তোলা নৌকাগুলি গণিতেছিল, অথবা বলাবলি করিতেছিল,

"গোকুল মাঝি নৌকা লইয়া ফিরিয়া আসে নাই। না?"

"না।"

"সে কোথায় গিয়াছে জান?"

"জানি। ময়নাসুন্দরীর খালে গিয়াছে।"

"সঙ্গে নিয়াছে কি ?"

"ঢের নারিকেল। সুপারি। আর পানও বুঝি।"

"এবার তার দেরী হইতেছে।"

"তা বটে।"

যেন গোকুল মাঝির সম্বন্ধে এত খবর না রাখিলে তাদের ঘুম হয় না।

"রামচাঁদ মিত্র তাঁর ছেলেকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

"বটে!"

"ছেলে বিধবা-বিবাহ করিয়াছিল।"

"আমি তার বউকে দেখিয়াছি। বেশ সুন্দরী।"

"অত সুন্দরীকে সে যে বিবাহ করিবে তার আর আশ্চর্য্য কি ?"

"বাপ কিন্তু সে কথা বুঝিল না।"

"বুঝিবে কি ? বৌকে চোখেই দেখিতে চাহিল না।"

"ছেলের কিন্তু তেজ আছে। বলে, গ্রামে বহু লোক কুকর্ম্ম করিয়া বুক ফুলাইয়া চলিতেছে। আর আমি একটা ভাল কাজ করিলাম, সেই জন্য অপমান ? আমি সহ্য করিব না।"

ইহা দুই বৎসর আগেকার ঘটনা। এ সম্বন্ধে এই দুই বালক পূর্ব্বে এইরূপ শত শত আলোচনা করিয়াছে। দুই বৎসরের পুরাতন ঘটনার উত্তেজনা ও উত্তাপ গ্রামের মধ্যেও ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়াছে।

এ সব অবান্তর বিষয়। দুই জনের মনের মধ্যে যে কথা, যে প্রশ্ন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এ ত তা নয়। সে আরো গভীর বিষয়।

দুই জনে আজ এক সঙ্গে রমেশ বসুর অট্টালিকা দেখিতে গিয়াছিল। বসু তাদের দেখিতে পাইয়া কাছে ডাকিল। তারপর আদর করিয়া ঘর ও বাহিরের সকল কৌশল, কারুকার্য্য ও সৌন্দর্য্য দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল। দুই জনে বসুর ঐশ্বর্য্যে ও ব্যবহারে চমৎকৃত ও নির্ব্বাক্ হইয়া গেল।

এখন সেই কথাই উভয়ের মনে ঘোরাফেরা করিতেছিল। ভাবিতেছিল, "আ! আমাদের যদি এইরূপ এক একটি অট্টালিকা থাকিত! আমরা যদি রমেশ বসু হইতাম!"

অবশেষে দুই জনে পদচারণা বন্ধ করিয়া অশথ গাছের তলায় বসিল। এতক্ষণে মুখ ফুটিল। কালীচরণ বলিল,

"সিংহ! লোকটা কি চমৎকার প্রাসাদ বানাইতেছে!"

"উহার অনেক টাকা আছে, কালি!"

"টাকা ত আছেই। কিন্তু বুদ্ধিও আছে। দেখ, সে ত কৃপণের মত টাকা জমাইয়া রাখিল না। হরি পালিতেরও ত টাকা কম ছিল না।"

"সে কৃপণ।"

"কিন্তু অত টাকা জমাইয়া তার কি হইয়াছে? তার ছেলেরা এখন দুই হাতে টাকা উড়াইতেছে।"

"বসু কিন্তু লোকটাও কি চমৎকার!"

কালীচরণ ভাবিতে লাগিল। পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, এত টাকা লোকটা কোথায় পাইল?"

"উপার্জ্জন করিয়াছে।"

"নিশ্চয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কি করিয়া উপার্জ্জন করিল?"

"যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায়।"

"না জানি কতগুলি টাকার মালিক সে!" পরমেশ্বরের দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

কালীচরণ ধীরে ধীরে বলিল, "সিংহ, শুন। মার কাছে শুনিয়াছি, এই রমেশ বসু একদিন অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। তিন কুলে আপনার বলিতে অথবা একটু খানি স্নেহ দিতে তার কেহ ছিল না। পথে পথে কুকুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইত। দুই বেলা ভাল করিয়া খাইতে পারিত

না। আজ সে কথা কে বিশ্বাস করিবে বল? কিন্তু তার শরীর বরাবর বলিষ্ঠ ছিল। অনাহার, অত্যাচার তাকে কাবু করিতে পারিত না। এমন সময় গ্রামের মোড়ল একদিন তাকে বলিল, 'ওরে রমেশ! এমন শক্ত সমর্থ ছেলে, তুই কাজ করিস্ না কেন?'

"সে বলিল, 'তোমরা কাজ দাও না। তা আমি কি কাজ করিব?'

"সে দিন হইতে রমেশ বসুর মোড়লের বাড়ীতে কাজ জুটিল। সে কি কাজ? রমেশ কাঁদিয়া বলিত, 'ইহার চেয়ে আমার অনাহার ভাল ছিল। এ অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না। কেহ যদি আমায় শুধু কলিকাতা যাইবার পথ-খরচটা দিয়া দেয় ত আমি লাখপতি হইয়া ফিরিয়া আসি।'

"এই কথা যে শুনিল, সেই হাসিয়া খুন। লোকে তাকে পথে ঘাটে বিদ্রূপ করিতে ও গঞ্জনা দিতে লাগিল। কি রে লাখপতির পো!' 'দেখি দেখি তোর লাখ টাকার ঝুলিটা দেখি।'

"কিন্তু সিংহ তারাই আজ আসিয়া রমেশ বসুর দুই বেলা খোসামোদ করিতেছে।

"আমার মা বসুর এই কথা শুনিল। বলিল, 'কি? কলিকাতা যাইবার পথ-খরচ পাইলে একটা লোক লাখপতি হইয়া ফিরিয়া আসিবে? সে ত আমার গ্রামের লাভ। আমি খরচ দিব। যেমন করিয়া পারি দিব।'

"বসুর সঙ্গে মার অল্পস্বল্প আলাপ ছিল। মা টাকার যোগাড় করিল। কেমন করিয়া জানি না। মাও আমায় বলে নাই। সেই টাকা লুকাইয়া বসুর হাতে দিয়া বলিল, 'আজই রওনা হও।' বসু মায়ের চেয়ে বয়সে বড়। তবু বসু ভূমিষ্ট হইয়া মাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। বলিল, 'তোমার মত মেয়ে যে দিন আমাদের

প্রত্যেকের ঘরে জন্মিবে, সে দিন বাংলা দেশের আর কোন ভয় থাকিবে না। আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার মত মেয়ে পাই।'

"এই কথা বলিতে বলিতে আজও মায়ের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে থাকে।"

"কালি! এই জন্যই বুঝি বসু আজ আমাদের এমন আদর করিয়া ঘরবাড়ী দেখাইয়াছে?"

"তা জানি না। কিন্তু রমেশ বসু ত সকলের সঙ্গেই ভদ্র ব্যবহার করিয়া থাকে।

"তারপর শুন। তখনো মার বিবাহ হয় নাই। মার বাবা কোন সূত্রে সব কথাই জানিতে পারিলেন। তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। মাকে ডাকাইলেন। মা আসিলে বলিলেন,

" 'তুমি রমেশকে পথ-খরচ দিয়াছ?'

" 'দিয়াছি।'

" 'কেন দিয়াছ?'

" 'সে অনাথ।'

"সে অনাথ! তাতে তোমার কি? সে তোমার কে যে তার জন্য এত মাথাব্যথা?'

"মায়ের চোখে জল আসিল। 'সে আমার কেহ নয়। কিন্তু আমার গ্রামের লোক ত। শুধু পথ-খরচ পাইয়াই যদি সে লাখপতি হইয়া ফিরিয়া আসে আমার গ্রামের উন্নতি হইবে।'

"দাদা মহাশয় উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। 'পাগল হইয়াছ! রমেশ হইবে লাখপতি? যার এক দিনের খাবার সংস্থান নাই? আমি বুড়া হইয়া গেলাম, আমি লোক চিনি না? রমেশের মধ্যে ভাল লোকের লক্ষণ ত কিছু দেখিতে পাই না।' তারপর কঠোর স্বরে, 'কিন্তু তুমি

ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি যে কাজটা করিয়াছ, সে কি ভাল করিয়াছ? লোকে শুনিলে কি বলিবে?'

"মা চোখের জল না মুছিয়াই নির্ভীক ভাবে উত্তর করিল, 'আমি ত মন্দ কাজ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।'

"'নিজের ভালমন্দ তুমি যদি নিজে বুঝিতে না পার, তবে আর আমি কি করিব, বল? আপনার পায়ে কেহ ইচ্ছা করিয়া কুড়াল মারিলে তাকে কে রক্ষা করিবে?'

"মা চুপ করিয়া রহিল। তখন দাদা মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, টাকা কোথায় পাইলে?'

"'বলিব না।'

"এ দিকে ততক্ষণে রমেশ বসু টাকা লইয়া সে দিনই রওনা হইয়া গিয়াছে। তারপর কি হইয়া ফিরিয়াছে, তা ত দেখিতেই পাইতেছ।"

কালীচরণের কথা শেষ হইলে দু জনে অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শেষে পরমেশ্বরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহিনী কি তোমার মার কাছে শুনিয়াছ?"

"হাঁ। মা নিজে বলিয়াছে।"

আবার বহু ক্ষণ চুপ করিয়া কাটিল। তারপর পরমেশ্বর কহিল, "কালি! শুনিয়াছি কলিকাতার পথে ঘাটে পয়সা ছড়ান রহিয়াছে। সেই পয়সা কুড়াইবার লোকের অভাব। রমেশ বসুও দেখিতেছি কলিকাতা হইতেই অগাধ টাকা লইয়া আসিয়াছে। সুতরাং কথাটা মিথ্যা নয়।"

কিছুমাত্র না ভাবিয়া কালীচরণ বলিল, "চল, কলিকাতায় যাইব।"

পরমেশ্বরও তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "তাই চল।"

কিন্তু ১৮।১৯ বৎসরের ছেলেরা কি করিয়া কলিকাতায় যাইবে?

বাড়ীর সকলেই বাধা ত দিবেই। হাত খরচই বা পাইবে কোথায়? তখন প্রস্তাব হইল, "মায়ের বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লইবে এবং পলাইয়া যাইবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সে দিন আর নাই। সে কালীচরণ ও পরমেশ্বরপ্রসাদও নাই। তারা দুই জন কলিকাতার দুই জায়গায় মস্ত বড় বড় প্রাসাদ বানাইয়াছে। তারা শহরের মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। একদিন যে রমেশ বসুকে তারা ঈর্ষা করিয়াছিল, আজ সেই রকম দশটা রমেশ বসুকে কিনিতে পারে।

পারিবারিক চিঠিপত্র চলিয়াছে। কিন্তু আজ ১২।১৩ বছর তারা গ্রামে আসে নাই। সেই বার যুক্তি করিয়া দু জনে একসঙ্গে গ্রামে আসিল। আর গ্রামের সমস্ত পরিবারের মধ্যে তোলপাড় আরম্ভ হইল।

রমেশ বসু মারা গিয়াছে। যে সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া একদিন তাদের মনে বড়লোক হইবার সঙ্কল্প জাগিয়াছিল, রমেশ তা গ্রামবাসীকে দান করিয়া গিয়াছে। সেই কোঠাবাড়ী এখন লাইব্রেরী বিশেষ। আর তা কালীচরণের জননীর নামে উৎসর্গীকৃত। কালীচরণ বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। এত বড় একটা খবর কেহ তাকে জানায় নাই। সে সেই লাইব্রেরীর দিকে দূর হইতে অনেক ক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার মনে হইল, রমেশ বসু সকলের উপর টেক্কা দিয়াছে! সে এবং পরমেশ্বর-

প্রসাদ আজ বহু গুণ ধনী হইয়াছে বটে। কিন্তু এই গ্রামের ইতিহাসে কার নাম প্রথম উচ্চারিত হইবে? রমেশ বসুর। সহায়হীন সম্বলহীন অনাথ কোন্ বালক অধ্যবসায়ের প্রথম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত? রমেশ বসু। গ্রামের মধ্যে প্রথম একটা স্মরণীয় কাজ—লাইব্রেরী স্থাপন, কে করিল? রমেশ বসু। কাল তাকে জয়ী করিয়াছে। কালীচরণের দুর্ভাগ্য, সে রমেশ বসুর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এর উপর ত হাত নাই।

আপনা হইতে কালীচরণের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। সে তাড়াতাড়ি লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া ১০০৲ টাকা চাঁদা ও ২০০৲ টাকার বই স্বাক্ষর করিয়া দিল। টাকাটা তখনি দিল। বইগুলি কলিকাতা হইতে পাঠাইবে বলিল।

কালীচরণ ও পরমেশ্বরের পলাইয়া যাওয়ার পর গ্রামে কত না আন্দোলন উঠিয়াছিল! কত লোকে কত কথা বলিয়াছিল! আজ সেই সব লোক অগ্রসর হইয়া তাদের অভ্যর্থনা করিল ও আপ্যায়িত করিল। কেহ মনে করাইয়া দিল না, তোমরা অত্যন্ত কুকর্ম্ম করিয়াছিলে।

কলিকাতায় ফিরিয়া পরমেশ্বরপ্রসাদ বলিল, "কালি! আজও কি তোমার মনের আপ্‌শোষ দূর হইল না?"

"না।"

"কিন্তু আমি বলি, এ তোমার নির্বুদ্ধিতা।"

"হইতে পারে। অস্বীকার করি না।"

"১৮।১৯ বছর হইতে বইয়ের সংসর্গ ছাড়িয়াছি। আজ পর্য্যন্ত আর বই হাতে লই নাই। অবকাশ পাই নাই। কিন্তু সে জন্য আমি একটুও অনুতপ্ত নই।"

"আমি অনুতপ্ত। আমি বই বেচিয়া জীবন কাটাইতেছি। সুতরাং আমার সুযোগ যথেষ্ট ছিল, ইচ্ছা করিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কক্ষে কক্ষে

পরিভ্রমণ করিতে পারিতাম। করি নাই। এখন অনুতাপ হয়। তোমার কথা আলাদা। তুমি সারাজীবন কয়লা বেচিতেছ। অন্য দিকে মন দিবার সুযোগ পাও নাই।”

“কিন্তু বই বেচিয়া তুমি যদি টাকা না করিতে, যদি শুধু বইয়ের পোকা হইয়া থাকিতে, তবে কি তোমার এত টাকা হইত, না এরূপ মান সম্ভ্রম পাইতে?”

“ভুল বুঝিও না সিংহ! টাকার জন্যই দু জনে বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলাম। টাকা যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছি। কিন্তু ইহারি মধ্যে ফাঁক যথেষ্ট ছিল। ইচ্ছা করিলে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষাও করিতে পারিতাম।”

“এ তোমার ভাবুকতা মাত্র। আমি ত দেখি তুমি বা আমি কোন অংশেই তোমার বিদ্বান্‌দের চেয়ে খাটো নই।”

“কি বল সিংহ! আমি আর পণ্ডিত ও বিদ্বান্ ব্যক্তি সমান হইলাম? তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে। ধনীদের সঙ্গে উচ্চ আসনে বসিতে পারি। কিন্তু বিদ্বান্ মণ্ডলীর মধ্যে আমার স্থান কোথায়!”

“একটা মানুষ একসঙ্গে সব কিছু আর হইতে পারে না।”

“কেন পারে না? আমি নই, এইমাত্র।”

“কেন নও? কালি! তুমি আমি যে এত বছর ধরিয়া এত যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে আমাদের ব্যবসা দুটা গড়িয়া তুলিলাম তা কোন কবির কাব্য-সৃষ্টি হইতে কম, তুমি বলিতে চাও? আসুক্ না তোমার পড়ুয়ারা বা কবিরা। করুক্ না দেখি নিজেদের মাথা হইতে ব্যবসা দাঁড়। বুঝিব বিদ্যার দৌড়।”

কালীচরণ আর তর্ক করিল না। কারণ তার মনে বরাবর এই একটা ব্যথা সঞ্চিত হইয়া ছিল। তর্ক করিয়া এই ব্যথা অপরকে বুঝান

যায় না। বিশেষ, পরমেশ্বরপ্রসাদ ইহাকে মানসিক দুর্ব্বলতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়।

ইতিমধ্যে কালীচরণ ও পরমেশ্বরপ্রসাদ বিবাহ করিয়াছিল। উভয়ের সন্তানও হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বে পরমেশ্বর পরামর্শ দিল:

"কালি! দেখিয়া শুনিয়া বড়লোকের মেয়ে বিবাহ করিয়া ঘরে আন।"

"কেন সিংহ! আমার এই হাত দুটা কি এতই অকর্ম্মণ্য যে পরের টাকার উপর লোভ করিতে যাইব? আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছি, অন্যের নিকট হইতে এক পয়সাও লইব না। বিবাহের সময় সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব না।"

"কিন্তু কালি! যখন তুমি গরীব ছিলে, তখন এই প্রতিজ্ঞার সার্থকতা ছিল। এখন তাড়াতাড়ি বড়লোক হইতেছ। সুতরাং বড়লোকের মেয়ে বিবাহ করা অন্যায় হইবে না। আরো দেখ, গরীবের মেয়ে তোমার সংসারে আসিয়া পদে পদে অপ্রস্তুত হইবে। কায়দা-কানুন বাঁচাইয়া চলিতে পারিবে না।"

কালীচরণ হাসিয়া উত্তর করিল, "কেন, আমি কি এক কালে গরীব ছিলাম না? গরীবের মেয়েই আমার ঘরে বেশী শোভা পাইবে।"

বড়লোকের মেয়ে বিবাহ করার ও বিনা-ক্লেশে আরো টাকা পাওয়ার মর্য্যাদা কালীচরণ বুঝিল না। সুতরাং সে গরীবের মেয়েকে বিবাহ করিল। পরমেশ্বরপ্রসাদ বড়লোকের জামাই হইল। তার আয় দুই গুণ বাড়িয়া গেল।

তারপর প্রথমে পরমেশ্বরের এক মেয়ে হইল। তার দুই তিন বছর পরে কালীচরণের প্রথম সন্তান হইল—পুত্র।

কালীচরণের পুত্র হওয়া অবধি পরমেশ্বর কালীচরণকে ধরিয়া বসিল,

"কালি, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে।" সাহস করিয়া টাকার কথা উঠাইতে পারিল না।

কালীচরণ হাস্য করিয়া বলিল, "গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি। আগে ছেলেমেয়ে বড় হোক্ তারপর দেখা যাইবে।"

"ছেলেমেয়ে একদিন নিশ্চয় বড় হইবে। কিন্তু তত দিন আমরা বাঁচিয়া নাও থাকিতে পারি। তুমি কথা দিলে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

"তোমার মেয়ে যে আমার ছেলের চেয়ে বয়সে বড় হইল।"

"তা ২।১ বছর এদিক-ওদিকে কি এমন আসে যায়?"

"কিন্তু সিংহ। এত তাড়াতাড়ি করিবার কোন দরকার দেখি না। আমার ছেলে ত রহিলই। তোমার আরো মেয়ে জন্মিতে পারে। আমার ছেলে যদি বাঁচিয়া থাকে, তোমার কোন না কোন মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিব। কথা দিলাম।"

"ঠিক ত?"

কালীচরণের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "এত দিন যাবৎ কালীচরণকে দেখিয়া আসিতেছ। কোন দিন কি দেখিয়াছ তার কথার ব্যতিক্রম হইয়াছে?"

পরমেশ্বর কালীচরণকে পুলকিত মনে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "না। রাগ করিও না ভাই। আমি তোমাকে ভাল করিয়া চিনি। কিন্তু তোমার ছেলে যদি তোমার কথা না রাখে?"

"আশা করি, তেমন কুপুত্র আমার হইবে না। তুমিও প্রার্থনা কর।"

"নিশ্চয়।"

ইহার পর কালীচরণ ও পরমেশ্বর দুই জনে দুটি পুত্র লাভ করিল। কিন্তু কাহারই আর মেয়ে হইল না। সুতরাং দুই পরিবারের মধ্যে জানাজানি হইয়া রহিল যে, কালীচরণের পুত্র পরমেশ্বরের কন্যাকে বিবাহ করিবে।

ছেলের বয়স যখন ছয় বৎসর হইল কালীচরণ তাকে পড়িবার জন্য ঢাকা পাঠাইয়া দিল।

পরমেশ্বর বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "ঢাকা কেন? কলিকাতায় এত স্কুল থাকিতে নিজের কাছে রাখিলে না?"

"দুই ছেলে ত কাছে রহিল। একজনকে দূরে পাঠাইলাম। আমি লেখাপড়া শিখি নাই। যদি আমার বাতাসে উহারও লেখাপড়া না হয়!"

পরমেশ্বর মুখে বলিল, "এ তোমার বাড়াবাড়ি।" কিন্তু মনে মনে বেশ প্রীত হইল।

ইহারই কিছু দিন পরে কালীচরণ পরমেশ্বরকে ডাকিয়া বলিল, "এস আমরা একটা ব্যাঙ্ক খুলি। বাঙ্গালীদের একটাও ব্যাঙ্ক নাই।"

পরমেশ্বর তাচ্ছিল্যের সহিত মুখ উল্টাইয়া উত্তর করিল, "দরকার নাই।'

কালীচরণ দৃঢ়তার সহিত বলিল, "আছে বই কি? আমি স্থির করিয়াছি, খুলিব। তুমি যদি সহায় না হও, একা খুলিব।"

পরমেশ্বর দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "খেপিয়াছ? এমন বুদ্ধি তোমায় কে দিল?"

"কে আবার দিবে? নিজে হইতে হইয়াছে।"

"তুমি কি এই বয়সে তোমার স্ত্রী-পুত্রদের পথে ভাসাইতে চাও? এই সঙ্কল্প ছাড়িয়া দাও।"

"সিংহ, আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।"

পরমেশ্বর তার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে দেখিয়া পুনরায় বলিল, "সিংহ, ব্যবসা করিতে করিতে পদে পদে ত বুঝিতেছ, আমাদের দেশীয় একটা ব্যাঙ্ক না থাকায় কি অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

সর্ব্বদা সততা অবলম্বন করিয়া আমরা কি একটা ব্যাঙ্ক চালাইতে পারি না? আমার বিশ্বাস, পারি।"

"হায়! বৃথা তুমি এত দিন ব্যবসা চালাইয়াছ। বৃথা তোমার সব অভিজ্ঞতা। এত দিনেও তোমার জ্ঞান হইল না—বাঙ্গালীরা চোর। ফাঁকি দিতে পারিলে কেহই ছাড়িবে না। তুমি টাকা ধার দিয়া মারা পড়িবে। আমি লিখিয়া রাখিতেছি, তুমি শুন। শেষে তোমার ব্যাঙ্কের এমন অবস্থা দাঁড়াইবে যে উত্তমর্ণদের কারো টাকা তুমি দিতে পারিবে না। দেউলিয়া হইবে। শঠ কর্ম্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা না হয় নাই ধরিলাম।"

কালীচরণ ব্যথিত চিত্তে বলিল, "ভাই, কাকে গাল দিতেছ? এরা সব আমার দেশের লোক। অভাবে পড়িয়া স্বভাব নষ্ট হইয়াছে। আমি সবই জানি। সেই জন্য ইহাদের জন্য কিছু করিয়া যাইতে চাই।" পরমেশ্বরপ্রসাদ ততোঽধিক দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমি ইহার মধ্যে নাই। তুমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিতেছ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এদিকে ঢাকার জল বায়ুর মধ্যে কালীচরণের ছেলে বিজয়কুমার দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে। এক আত্মীয়ের বাড়ীতে সে থাকিত। বড়লোকের ছেলে। সুতরাং আদর-যত্নের ত্রুটি হইত না। অনেক খানি স্বাধীনতাও উপভোগ করিত।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রের দুইটা দিক্ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। ভাবুকতা ও ভালবাসিবার ইচ্ছা।

পনের বছরের ছেলে। সে যতখানি আদর পাইত, যতখানি নিজের ইচ্ছামত চলিবার সুবিধা ও সুযোগ পাইত, তার সমপাঠীদের মধ্যে কেহ তেমন পাইত না। অন্য কারণে না হোক্‌, এই কারণে সকলে তাকে হিংসা করিত। কিন্তু বিজয়ের মন পরিষ্কার ছিল। অন্যে তার সম্বন্ধে কি ভাবিল, না ভাবিল, তা নিয়া মাথা ঘামাইত না। তার নিজেরই যে ভাবিবার বিষয়ের অন্ত ছিল না।

বিজয়ের পিতা আত্মীয়কে বলিয়া দিয়াছিল, "সাবধান! ইহাকে শাসন করিবে না। যদি কোন রকম বেয়াদপি করে, আমাকে জানাইবে। আমি তার ব্যবস্থা করিব।" আত্মীয় ভাবিল, "আমার কি দায়? ছেলে খারাপ হয়, তোমাকেই ভুগিতে হইবে। বরং তাকে শাসন না করিয়া যদি তোমার প্রীতিভাজন হই, তাতে আমারই লাভ।" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, শাসনের অভাবে বিজয় বহিয়া গেল না। বরং তার সূক্ষ্ম আত্মবিচার-শক্তি জন্মিল। ধীরে ধীরে ঠেকিয়া সে ভালমন্দ বিচার করিতে শিখিল।

পনের বছরের ছেলে কি এত ভাবে? কি সে ভাবিতে পারে? তা বলিলে কি হয়। অনেক কথা সে ভাবিত। তার মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা যা তার চিত্তে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত তা হইতেছে, কি করিয়া খুব বিদ্বান্‌ হইবে, পৃথিবীর সকলকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। সে আপনার স্বপ্নে বিভোর হইয়া যেন চোখের সাম্‌নে দেখিতে পাইত, সে মস্ত বড় পণ্ডিত হইয়াছে, দেশ-বিদেশ দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, সকলে বলিতেছে, তার বিজয় নাম সার্থক হইয়াছে। আর তার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। তার সমস্ত চিত্ত সেই অভাবনীয় দিনের জন্য উন্মুখ তৃষিত হইয়া উঠিত।

দেশ-বিদেশে কত লোক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে জয়যাত্রা করিয়াছে।

বিজয় নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিত, হায়! তারাই কি সব লুটিয়া লইল? আমার জন্য কিছু রাখিল না? আছে আছে, আরো স্থান আছে, আরো লোক আসিবে; অপেক্ষা কর। বিজয়ও সেখানে আসিয়া দাঁড়াইবে। বিজয় কালজয়ী হইবে। জগতের জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমস্ত দেশের ঠাঁই আছে, আর বাংলা দেশের নাই? তা হইতে পারে না। বিজয় বাংলার প্রতিনিধি হইবে। অপেক্ষা কর। বিজয় আর একটু বড় হোক্। সে তার কাজ আরম্ভ করিবে। সে পিতাকে সুখী করিবে।

বিজয় জানে তার পিতার মনে জ্ঞানের অভাব-জনিত কি বেদনা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। কালীচরণ প্রত্যেকবার পুত্রকে বলিয়াছে, "বাছা, মনে রাখিও, মূর্খ হইয়া আমি অশেষ মনস্তাপ ভোগ করিতেছি, আমার সকল ঐশ্বর্য্যও আমাকে সুখী করিতে পারিতেছে না। আমার বড় আশা, আমি যা হইতে পারি নাই অথচ যা আমার তপস্যার বিষয়, তোমায় তা দেখিতে পাইব। তুমি জ্ঞানী হইবে, পণ্ডিত হইবে, বিদ্বান্ হইবে।"

বিজয় লজ্জাবশতঃ পিতার কথার উত্তর কোন দিন দিতে পারে নাই। কিন্তু মনে মনে বলিয়াছে, "প্রতিজ্ঞা করিতেছি, হইব।"

তার আত্মার আর এক ব্যাকুলতা—সে ভালবাসিতে চায়। ভালবাসা চায় না কি? চায় বই কি? কিন্তু সম্ভবত ভালবাসা পাওয়ার চেয়েও ভালবাসিবার আকাঙ্ক্ষা এখন প্রবল।

তার ভালবাসিবার জন জুটে নাই, তা নয়। সে জন ইন্দুবালা। ইন্দুবালা সেখানকার এক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে। কিন্তু বড় মিষ্ট তার ব্যবহার। বড় সুন্দর সে দেখিতে। কি তার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল! কি ভ্রূ! আর কি মনোহর তার দুই চোখ! তাকে যে দেখে সেই ভালবাসে। বিজয়ও ভালবাসিল।

পনের বছরের ছেলের ভালবাসাও কম তীব্র নহে। বিজয় ও ইন্দু সম-বয়সী। সেই জন্য দু জনে দু জনকে নাম ধরিয়া ডাকিত। কিন্তু ইন্দু যখন তাকে 'বিজয়' বলিয়া ডাকিত, তখন তার মনে হইত বিশ্ব-জগতে এমন মিষ্ট করিয়া যেন আর কেহ তাকে ডাকিতে পারে না। যত বার সে ইন্দুর সরল নির্ভরতা-মাখা দুই চোখের দিকে তাকাইত, তত বার আপনাকে ভুলিয়া যাইত। তত বার তার মনে হইত, একে কি করিয়া সুখী করা যায়!

ইন্দুর মনের মধ্যে কোন ভালবাসার বালাই ছিল কি না, জানি না। কিন্তু বিজয় যে তাকে যখন তখন বলিত, "তুমি বড় সুন্দর," সে কথা তার বড় ভাল লাগিত। ঐ কথায় সে বিজয়ের উপর একদিনও রাগ করিতে পারিত না। বরং ঐ কথা শুনিবার জন্য যখন তখন আসিত।

ইন্দুর গুণেরও কি আর অন্ত আছে! পড়াশুনায় সে বিজয়ের সমান। ঘরের কাজ ও সিলাই জানে। তার উপর অল্প বয়সে সে কবিতা লিখিতে শিখিয়াছে। বিজয় অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও তার সব কবিতা দেখিতে পায় নাই। মাঝে মাঝে ২।১টা দেখিতে পায়। বেচারা তাতেই সন্তুষ্ট।

বিজয় অনেক রকম করিয়া তার অন্তরের ভালবাসা ইন্দুকে জানাইতে চায়। কিন্তু হায়! পনের বছরের পক্ষে তা কতটুকু সম্ভব? বিজয় কিছুতেই আপনার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। কোন প্রকার প্রকাশই তার মনঃপূত হয় না। সে যেন আরো ভালবাসিতে পারে, আরো।

ইন্দুকে কেন্দ্র করিয়া তার ভাবুকতার সাহায্যে সে এক পরম পবিত্র নিভৃত ধ্যানলোক গড়িয়া তুলিতেছে। সে বিদ্বান্ হইবে, মহান্ হইবে,

ইন্দুর জন্য। সে কি ইন্দুকে তাতে খুসী করিতে পারিবে না? ইন্দু কি তাকে ভালবাসিবে না? সে স্বপ্ন দেখিতেছে, জ্ঞানবলে দশ দিক্ জয় করিয়া সে যে সাধনার মন্দির গড়িয়া তুলিতেছে, সে মন্দিরের দেবী ইন্দু। আর পূজারী বিজয় স্বয়ং।

এইরূপে বছর কাটিতে লাগিল। বিজয় শরীরে ও মনে বাড়িতে লাগিল। আর দিন দিন তার চিত্তের মধ্যে জ্ঞানের ও ভালবাসার জন্য অদম্য পিপাসা জন্মিতে লাগিল। এর কোন্‌টা বেশী প্রবল সে বলিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান ও ইন্দু—দুই-ই তার পক্ষে সমান কাম্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কালীচরণের ব্যাঙ্ক ফেল মারিল। সে একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তার যথাসর্ব্বস্ব সে ঐ ব্যাঙ্কের জন্য ঢালিয়া দিয়াছিল। মাস দুইয়ের মধ্যে পড়াশুনা করিতে বিজয় কোথায় বিলাত যাইবে, না এই দুর্দ্দৈব!

কালীচরণের প্রথম কথাই মনে হইল, "ভাগ্যে বিজয় কাছে নাই। নহিলে সে গুরু আঘাত পাইত। যেমন করিয়া হউক মান বাঁচাইতে হইবে, দেউলিয়া হইব না, তাকেও বিলাত পাঠাইব।"

কিন্তু উপায়?

কালীচরণ পরমেশ্বরের কাছে ছুটিয়া গেল, "ভাই, বাঁচাও।"

পরমেশ্বরপ্রসাদ সকল কথা শুনিয়া বলিল, "তখন তোমাকে কত বারণ করিয়াছিলাম। শুনলে না। আমি ত আগেই জানিতাম, এরূপ হইবে। এই অপদার্থ, অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী জাতের জন্য কখনো কি কিছু করিতে আছে?"

কালীচরণের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, "বাঙ্গালী জাতিকে অকারণ গালি দিও না। আমার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জলে যাইতে বসিয়াছে। আমার যদি আরও পঞ্চাশ লক্ষ টাকা থাকিত, আমি তৎক্ষণাৎ এই ব্যাঙ্কে ঢালিয়া দিতাম। দ্বিধামাত্র করিতাম না।"

"সে পঞ্চাশ লক্ষ টাকাও জলে যাইত। কিন্তু তাতে কার কোন্ পরমার্থ সাধিত হইত?"

"সিংহ! তর্কের সময় নাই।"

"আমি টাকা দিব।"

কালীচরণ পরমেশ্বরপ্রসাদের হাত জড়াইয়া ধরিল। "আমি জানিতাম তুমি দিবে। আমি জানি—"

"কিন্তু তোমাকে তোমার কথা রাখিতে হইবে। নচেৎ নহে।"

"কি কথা?"

"বিজয়ের সঙ্গে তিলোত্তমার বিবাহ দাও।"

কালীচরণ বিজয় ও ইন্দুবালার ভালবাসার কথা একেবারে জানিত না, তাহা নহে। সে ২।৩ বার ঢাকা গিয়া ইন্দুবালাকে দেখিয়াও আসিয়াছে। তিলোত্তমা মন্দ মেয়ে নয়। দেখিতে শুনিতেও বেশ। কিন্তু ভাবে বোধ হয়, বিজয় ইন্দুকে পাইলে সুখী হইবে। কোন্ পিতামাতা ছেলেমেয়ের সুখ না চায়?

সুতরাং একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "সিংহ! টাকাটা আমাকে এখন না হয় ঋণ হিসাবেই দাও না? আমি কয়েক বৎসরের মধ্যে সুদশুদ্ধ শোধ করিয়া দিব।"

পরমেশ্বর তার ভাব দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। "বন্ধু! আমাদের বন্ধুত্বের অপমান করিতেছ।"

কালীচরণ মিনতি করিয়া বলিল, "ক্ষমা কর।"

"কালি! নিজে যে কথা দিয়াছিলে, তা কি ভুলিয়া গিয়াছ? না, সেই কথামত কাজ করিতে ভয় পাইতেছ?"

কালীচরণের মনের মধ্যে পুত্রবধূ রূপে ইন্দুবালার মুখ জাগিয়া উঠিল। সে কাতর ভাবে বলিল, "না না সিংহ! ভয়ের কথা নয়। আমি প্রতিশ্রুতি রাখিব। তুমি আমার দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ দাও। আপত্তি করিব না।"

পরমেশ্বর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন, বিজয়ের সঙ্গে আপত্তি আছে না কি?"

কালীচরণ উত্তর দিল না। পরমেশ্বর কহিল, "কিন্তু আমি তোমার বিজয়কেই চাই। অন্য কাউকে নয়। আমি তোমায় টাকা দিব না, আমায় এমন ছোটলোক মনে করিও না। কিন্তু বড় সাধ ছিল, তোমার বিজয়ের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিব। তুমি যদি না চাও বিবাহ হইবে না। কিন্তু কালি! প্রতিজ্ঞা তুমি একদিন করিয়াছিলে।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ টাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

তখন কালীচরণ বিজয় ও ইন্দুবালা ঘটিত সকল ব্যাপার খুলিয়া বলিল। "ভাবিয়া দেখ, ছেলের মন যদি সেখানে বসিয়া গিয়া থাকে, তবে তাকে অসুখী করিয়া আমাদের কারো কিছু লাভ হইবে না।"

পরমেশ্বর সমস্ত বিষয়টাই হাসিয়া উড়াইয়া দিল। এই কথা! বিজয় যে এখনো নেহাৎ ছেলেমানুষ। সে ভালবাসার কথা অতশত কি বুঝে! ইন্দুর সহিত তার যদি তেমন কিছু ঘনিষ্ঠতাও হইয়া থাকে, তবু তা এমন কিছু দোষের ত নহে। বিবাহের পর ইন্দুকে আর মনেও থাকিবে না। আর তোমার ছেলে তেমন নয়। সে কখন তোমার কথা অবহেলা করিবে না।

"সেই জন্যই কি তাকে জোর করিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে করানো আমার উচিত হইবে?"

কিন্তু তখন কালীচরণের মনে জাগিতেছে সমস্ত সম্পত্তি নাশের কথা, তার চেয়েও ভীষণ সমগ্র দেশের সম্মুখে অপমান, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা। এই টাকা না পাইলে সে পাগল হইয়া যাইত। টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হইল, সে পরমেশ্বরের কাছে বহু দিন প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ রহিয়াছে। তাকে এখন তার কথা রাখিতেই হইবে। ইন্দুবালার মুখ বাতাসে মিলাইয়া গেল। মহানুভবতায় কি পরমেশ্বরপ্রসাদ কালীচরণকে আজ হারাইয়া দিবে?

কালীচরণ দৃঢ়স্বরে বলিল, "সিংহ! আমি আমার কথা রাখিব। বিজয়ের সঙ্গেই তিলোত্তমার বিবাহ দাও।" পরমেশ্বর কোন কথা বলিল না। উঠিয়া আলিঙ্গন করিল মাত্র।

"কিন্তু কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে, ভাই। ছেলেটা বিলাত হইতে আসুক। তত দিনের অদর্শনে সে ইন্দুবালাকেও ভুলিয়া যাইতে পারে। আমি সে ব্যবস্থারও চেষ্টা করিব।"

পরমেশ্বর স্বীকার করিল, "আমার কোন আপত্তি নাই।"

দুই পরিবারের এই সব কথাবার্তার কথা বিজয় কিছুই জানিতে পারিল না। সে প্রফুল্লমনে পিতাকে প্রণাম করিয়া বিলাত চলিয়া গেল। মনে মনে সঙ্কল্প করিল, এইবার চির ঈপ্সীত সময় আসিয়াছে। একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে, ভারত-সন্তান জগৎ-সভায় তার স্থান করিয়া লইতে পারে কি না।

বিজয়ের প্রস্থানের পর কালীচরণ একদিন ঢাকা আসিয়া উপস্থিত। সে ইন্দুবালার বাপের সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

ইন্দু আসিয়া পান দিয়া যাইতেই কালীচরণ বলিল, "আপনার মেয়ের

ত বিবাহের বয়স হইতে চলিল। তা মেয়ের বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছেন না?"

"বয়স হইতে চলিল কি? বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে বলুন। এই তার একুশ বছর চলিতেছে। তা মেয়ে আমার বিবাহ করিতে চায় না। আমিও মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারি না।"

কালীচরণ কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল। এমন সময় ইন্দু ঘরে ঢুকিয়া কালীচরণকে নম্র ভাবে প্রণাম করিল। বলিল, "আমি জানি, আপনি বিজয়ের পিতা।"

তার বাবা এবং কালীচরণ আশ্চর্য্য হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "কেমন করিয়া বুঝিলে?"

"বিজয় আপনার সম্বন্ধে এত গল্প করিয়াছে যে, আপনাকে চিনিতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই।" তারপর হাসিয়া, "আপনার ছেলেকে যেন যে সে লোক মনে করিবেন না। দেখিবেন, বিলাত হইতে খুব নাম করিয়া আসিবে। কালে পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত লোক হইবে। ইতিমধ্যে এখানেই অধ্যাপকদের বিস্মিত করিয়া ফেলিয়াছে। নয় বাবা?"

তার বাবা মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। "আপনি বিজয়ের পিতা? আজ আমার কি সৌভাগ্য!"

কালীচরণের মুখ পিতৃ-গর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে উজ্জ্বলতা বেশী ক্ষণ রহিল না। তার মনে এই ভাবিয়া জ্বালা করিতে লাগিল যে কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই সব সুন্দর মানুষের প্রাণে ব্যথা দিতে হইবে। তার ইচ্ছা হইতেছিল সে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া বাঁচে। কিন্তু সে টলিল না। যে কথা বলিবার জন্য আসিয়াছিল, তা তাকে বলিয়া যাইতে হইবে।

কালীচরণ ইন্দুবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "মা, আজ

আমি অত্যন্ত নির্দ্দয়ের মত কাজ করিতে আসিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে তোমাকে যত বার দেখিয়াছি, ভাল্ লাগিয়াছে। কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। আমি জানি, তুমি বিজয়কে ভালবাস। বিজয়ও তোমায় ভালবাসে। তোমাদের উভয়ের মনে দাগা দিয়া আমাকে অন্য মেয়ের সহিত বিজয়ের বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু তুমি বুদ্ধিমতী। সকল কথা বিবেচনা করিয়া আমার এ অপরাধ মার্জনা করিও।" এই বলিয়া সাশ্রু নেত্রে কালীচরণ সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল।

ইন্দুবালার পিতা মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছিলেন। কিন্তু কালীচরণ যত ক্ষণ কথা বলিতেছিল, ইন্দু একটিও প্রশ্ন করিল না, স্তব্ধ পাষাণের মত বসিয়া রহিল। তাকে দেখিয়া মনে হইল সে যেন অন্য কোন্ লোকের জীব। মানুষের সুখ-দুঃখ তার সুখ-দুঃখ নয়।

তারপর কালীচরণ যখন থামিল, ইন্দু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, "আপনি মিথ্যা কাঁদিতেছেন। আমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। আমাকে তেমন মেয়ে মনে করিবেন না যে, আমি বিজয়ের ভবিষ্যতের পথে কণ্টক হইব। অবশ্য আমি ব্যথা পাইব। কারণ আমি তাকে সত্য সত্য ভালবাসি। কিন্তু আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। নহিলে আমি আরো বেশী ব্যথা পাইব।" এই বলিয়া ধীর পদক্ষেপে তৎক্ষণাৎ নিজের কক্ষে চলিয়া গেল। কালীচরণও হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় লইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিজয় দেখিল, তার চারি দিকের জগৎ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। সে যেন এত দিন কোন্ মহান্ স্বপ্নের মধ্যে ডুবিয়াছিল। তপস্বীর ন্যায় অনন্যকর্ম্মা হইয়া সে মহা-প্রচেষ্টা দ্বারা যে জ্ঞানের কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিতেছিল, সে যে জয়মাল্য শেষে অর্জন করিয়া আনিল, এ সব কথা যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাসের বেশী সময় নয়।

সাফল্যে ও জ্যোতিতে মণ্ডিত হইয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কোন স্নেহময় পিতা অগ্রসর হইয়া তাকে স্নেহে অভি-ষিক্ত করিল না। কারণ কালীচরণ ইতিমধ্যে স্বর্গারোহণ করিয়াছে। কিন্তু ইন্দুবালা? সেও কি জীবিত নাই? বিজয়ের নাম আজ দেশ-বিদেশে ধ্বনিত হইতেছে, এ খবরে সে কি সুখী হয় নাই? সে কি প্রেম-হৃদয়ে তার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে নাই? হায়! এ কয় বছর বিজয় যে একদিনও ইন্দুবালাকে ভুলিতে পারে নাই! নির্ব্বোধ বিজয়কে বিলাতের কোন সুন্দরী আপনার দিকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। সে কত আশা করিয়া আসিয়াছিল, বোম্বাইর উপকূলে ইন্দুর সুন্দর মুখখানি আবার দেখিতে পাইবে। কত দিন—কত দিন পরে সেই জীবন্ত মাধুরীকে সে আবার নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিবে, নিজের পরম প্রিয় মাতৃভাষায় কথা বলিতে পারিবে, দুই চোখ ভরিয়া তার রূপ পান করিতে পারিবে! আ, কি আরাম!

কিন্তু হায়! বিজয়ের সাধে বাদ সাধিল কে? বাড়ীতে পা দিয়াই শুনিল, তার বিবাহের আয়োজন হইতেছে। ইন্দুবালার সঙ্গে নহে। তিলোত্তমার সঙ্গে।

"কেন?"

মা আসিয়া সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলেন। বুঝিল, তিলোত্তমাকে বিবাহ করিয়া পিতৃঋণ শোধ করিতে হইবে। তার মৃত পিতা কাতর-দৃষ্টি লইয়া তার সম্মুখে আসিয়া যেন বলিতেছে, "হে পুত্র! আমায় উদ্ধার কর। আমায় মিথ্যাবাদী করিও না। আমার ঋণ শোধ কর।"

যখন জানিতে পারিল, ইন্দুবালাকে সে পাইবে না, তার হৃদয় শতধা হইয়া ফাটিয়া যাইতে চাহিল। জগতের যা কিছু সব তার কাছে বিস্বাদ হইয়া গেল। সে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ভাবিতে লাগিল, "হায়! আমার জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল। হায়! এই জন্যই কি আমার এত চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম? তাকে না পাইলাম ত আমার এই বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, এ কিসের জন্য?"

স্নেহময় দয়াময় পিতা। যে পিতার হৃদয়ের শত শত পরিচয়ে বিজয়ের আজও গর্ব্বে বুক ফুলিয়া উঠে, সেই পিতা কি পুত্রের এই পরম ব্যথার কথা একবার ভাবিয়া দেখিলেন না? অবিবেচকের মত তিনি পরমেশ্বর-প্রসাদকে কথা দিয়া তাকে অনন্ত অন্ধকারে ডুবাইয়া গেলেন? হায় ইন্দুবালা!

পিতা বাঁচিয়া থাকিলে বিজয় এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত কি না, জানি না। পিতার প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক আদেশ, প্রত্যেক কথা, বিজয়ের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ছিল। আজ সেই পিতার এই অন্তিম বাণী তাঁর কাছে কঠোর অথচ আরো পবিত্র হইয়া দেখা দিল।

পিতৃঋণ শোধ করিতে হইবে। পিতার কথা রাখিবার জন্য বিজয়কে যদি তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া দিতে হয়, তাতেও সে প্রস্তুত আছে। সেই পিতা যিনি জীবিতকালে একদিনও বিজয়ের সেবা লন নাই, কিন্তু বিজয়কে কত না সেবা ও প্রীতির দ্বারা ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন!

মনঃস্থির করিতে বিজয়ের বেশী সময় লাগিল না। সে সটান্ গিয়া পরমেশ্বরপ্রসাদকে কহিল, "আমি তিলোত্তমাকে বিবাহ করিতে চাই। কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে।"

"কি সর্ত্ত?"

"বাবা যে পঞ্চাশ লাখ টাকা আপনার কাছে ঋণ লইয়াছিলেন—"

"বিজয়! কেন তুমি অনর্থক সে কথা আজ তুলিতেছ? সে ত ঋণ নয়। আমি স্বেচ্ছায় দিয়াছি। তার কোন দলিল-পত্র ত নাই-ই। আর সে কথা আমাদের দুই পরিবার ভিন্ন অন্য কেহ জানে না। ভাইয়ের বিপদে ভাই কি ভাইয়ের সাহায্য করে না?"

"আমাকে বাধা দিবেন না। আমার কথা শেষ করিতে দিন। দলিল-পত্র থাকুক্ বা না থাকুক্, উহা ঋণ। আপনি বাবার ভাইয়ের তুল্য হইতে পারেন। কিন্তু আমার ত কেহ নন। আমি বলিতেছি, ঐ ঋণ-ভার আমি ঘাড়ে তুলিয়া লইলাম। মাসে মাসে আপনাকে অল্প অল্প করিয়া সমস্ত টাকা শোধ দিব। ইহাতে যদি আপনি সম্মত না হন, আমি আপনার মেয়েকে বিবাহ করিব না।"

পরমেশ্বরপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজয়কে জড়াইয়া ধরিল। "তুমি মহৎ। তোমার তুলনা কোথাও নাই। তোমার মত জামাই আমি কি সাধ করিয়া চাহিয়াছি? বহু তপস্যায় পাইয়াছি। তুমি যা চাও, তাই হইবে।"

বিজয় সে কথায় কান না দিয়া চলিয়া আসিল। সে তার সমস্ত সম্পত্তি ভাইদের নামে লিখিয়া দিল। বলিল, "এ সব আমার দরকার নাই। ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। আমি জ্ঞানের সেবায় মন-প্রাণ, জীবন-যৌবন উৎসর্গ করিতে চাই।" তারপর ২০০৲ টাকার একটা অধ্যাপকের কাজ লইল। এবং তিলোত্তমাকে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিল।

বিজয় ধীরে ধীরে পিতৃঋণ শোধ করিতেছে। প্রতি মাসে বেতন পাইবামাত্র ১০০৲ টাকা পরমেশ্বরের হাতে দিয়া আসে। তাতে তার অতুল আনন্দ। পিতার অঙ্গীকার সে গ্রহণ করিয়া তিলোত্তমাকে বিবাহ করিয়াছে এবং প্রাণপণে ভালবাসিতে চেষ্টা করিতেছে। সে সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছে, যখন মাসে ১২০০৲ টাকা করিয়া পাইবে এবং তাহা হইতে ১০০০৲ টাকা করিয়া পরমেশ্বরপ্রসাদকে দিতে পারিবে।

ইন্দুবালাকে হারাইয়া বিজয় ভাবিয়াছিল, সে চিরদিনের মত ডুবিয়া গেল। তার দ্বারা আর কিছু হইবে না। কিন্তু তখনি তার মনে পিতার মুখ জাগিয়া উঠিল। পিতা বলিয়াছিলেন, "আমার বড় আশা আমি যা হইতে পারি নাই অথচ যা আমার তপস্যার বিষয় তোমায় তা দেখিতে পাইব। তুমি জ্ঞানী হইবে, পণ্ডিত হইবে, বিদ্বান্ হইবে।" সেই কথা সে কোন দিন ভুলিতে পারিল না। সেই কথা শয়নে স্বপনে আজও তার কানের কাছে ধ্বনিত হইতেছে। পিতার মনের মধ্যে এ জন্য কি বেদনা ও অনুতাপ সঞ্চিত ছিল, তা কি সে ভুলিয়া যাইবে? না, না, বিজয় তার সাধনার অগ্রগতি থামাইতে পারে না। সে তার অন্তরের মধ্যস্থলে এই সাধনার প্রদীপ সর্ব্বদা জ্বালাইয়া রাখিবে। তার জয়যাত্রার রথ নব নব লোকে চালিত হইবে।

বিজয় পিতৃঋণ শোধ করিতে চায়। কিন্তু কোন্ ঋণ সে শোধ করিবে? কোন্ ঋণ সে শোধ করিতে পারিবে? বিজয় কি মনে করিয়াছে, তিলোত্তমাকে বিবাহ করিয়াছে, পিতার জন্য আপনার সকল সুখ বিসর্জ্জন দিতে চাহিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট? সে কি মনে করিয়াছে, পঞ্চাশ লাখ টাকার শেষ টাকাগুলি যে দিন গণিয়া সে পরমেশ্বর-প্রসাদের হাতে দিয়া আসিতে পারিবে, সে দিন তার মত সুখী কেহ থাকিবে না? তারপর, তার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং মহৎ স্বপ্ন সে যদি

চুরমার্ করিয়া দেয়, সে যদি জীবন-সংগ্রামের মধ্যে বৃহত্তর বাংলা গড়িবার কথা ভুলিয়া যায়, তবে তাকে কেহ দোষ দিতে পারিবে না? কেহ তাকে দায়ী করিতে পারিবে না?

না, বিজয়ের মুক্তি নাই। তার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল। সে দেখিল, তার পিতৃঋণ শোধ হয় নাই। তাকে আজীবন উৎসাহ ও মনোযোগের সঙ্গে উত্তরোত্তর জ্ঞানের সাধনা করিতে হইবে। কালজয়ী হইতে হইবে। পিতা অনন্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসিয়া যা হইতে পারেন নাই বলিয়া চোখের জল ফেলিয়াছেন, তাকে তাই হইতে হইবে। তবেই সে পিতৃঋণ শোধ করিতে পারিবে। নচেৎ নহে।

সুতরাং আবার তাকে ছুটিতে হইল। দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ, রাগ-বিরাগ, অভাব-দুর্ভাগ্য পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

শ্রাবণ, ১৩৩৩।